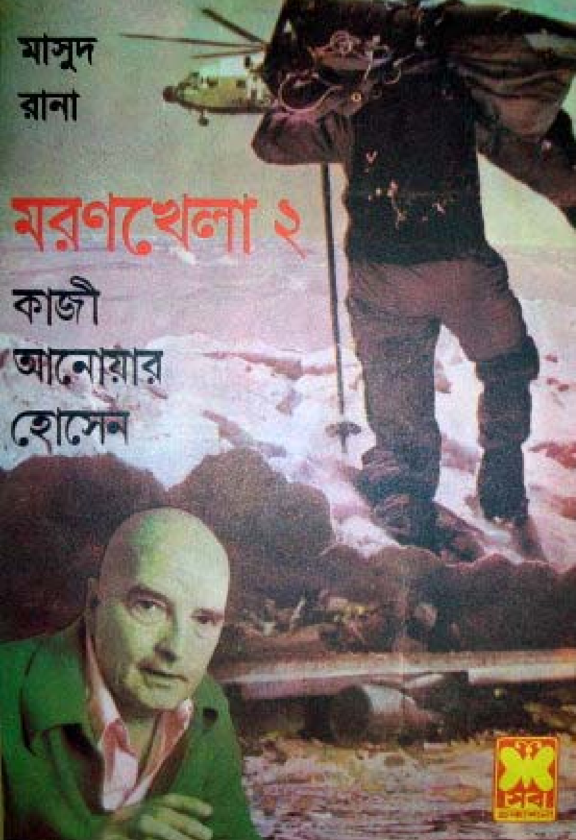

মাসুদ রানা
মরণখেলা ২
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

gvm` ivbv

giY‡Lj vÐ2

KvRx Av‡bvqvi †nv‡mb

এক

ছোট্ট বরফ দ্বীপ আই.আই. ফাইভের সাতশো ফিট ওপরে চক্কর দিচ্ছে প্লেনটা। কন্ট্রোল সামনে নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে পাইলট ম্যাট ইসটন। নিচে কিছুই দেখা যায় না, ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে ঠাণ্ডা প্রকৃতি। তার পিছনে, কার্গো কমপার্টমেন্টে দু'সারিতে বারোটা সীট, পারকা পরা বারোজন লোক বসে আছে।

ওরা সবাই ইউ.এস. কোস্টগার্ড সার্ভিসের লোক, এই কাজের জন্যে বিশেষভাবে বাছাই করা হয়েছে ওদের। লেনিনগ্রাদ থেকে রাশিয়ানরা আর্কটিকে একটা স্পেশাল সিকিউরিটি ডিটাচমেন্ট পাঠিয়েছে, কারণ তা না হলে অভিযানের ধরনটা অসামরিক থাকে না। ইচ্ছে করলে তারা সামরিক বাহিনী পাঠাতে পারত, কিন্তু তা পাঠালে আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার ঝুঁকি থাকত, কয়েক মাস পর মস্কোয় শীর্ষ বৈঠক বসার কথা রয়েছে বলে সে ঝুঁকি তারা নিতে চায়নি। ওয়াশিংটনও একই সাবধানতা অবলম্বন করেছে সেই একই কারণে। কোনভাবেই ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্টের ঝুঁকি নেয়া যাবে না।

পাইলটের কেবিন ঘেঁষে আরও এক জোড়া সীট দখল করে

রয়েছে দু'জন আরোহী, একজন ডাক্তার, অপরজন নার্স। ডা. পল ফ্লেমিং, বত্রিশ, একহারা চেহারার সুদর্শন প্রেমিক। সে তার হবু রাশিয়ান রোগী ইভেনকো রুস্তভের জন্যে সাথে করে মেডিকেল কিট আর অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে প্লেনের বাইরে তাকিয়ে আছে ডা. ফ্লেমিং, মেঘের মত ভেসে যেতে দেখছে গাঢ় কুয়াশা। তার পাশের সীটে বসে আছে নার্স এরিকা ফোলি। দু'জন ওরা দু'জনের হাত ধরে আছে।

দু'জনেই ওরা কোস্টগার্ড সার্ভিসে চাকরি করে, কিন্তু আর্কটিকে পাঠাবার জন্যে জরুরী তলব পেয়েছিল একা ডা. ফ্লেমিং। নার্সদের মধ্যে নির্দিষ্ট কাউকে নির্দেশ দিলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কথা ভেবে না-ও যেতে চাইতে পারে, তাই স্বেচ্ছাসেবিকা চাওয়া হয়। একজনই এগিয়ে আসে এবং তাকেই পাঠানো হয়েছে।

পল ফ্লেমিং আর এরিকার মধ্যে তিন বছর ধরে প্রেম চলছে। আগামী মাসের পনেরো তারিখে ওদের বিয়ে। এরিকা স্বেচ্ছায় যেতে চেয়েছে শুনে দিশেহারা বোধ করে পল। তার আপত্তি শুনে এরিকা জবাব দেয়, 'ধরা পড়ে গেলে তো! এতক্ষণ বলছিলে কাজটা মোটেও বিপজ্জনক নয়, কিন্তু যে-ই আমি যেতে চাইছি অমনি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছ। ওসব ধানাইপানাই ছাড়ো, তোমার সাথে যাচ্ছি আমি। নাম প্রত্যাহার করার কথা ফের যদি মুখে আনো, আমি তাহলে বিয়ের তারিখটাও অনির্দিষ্টকালের জন্যে পিছিয়ে দেয়ার কথা তুলব।'

দু'বছর নয় মাস সতেরো দিন সাধনার পর এরিকাকে রাজি করিয়েছে ফ্লেমিং, কাজেই এরপর চুপচাপ ব্যাপারটা মেনে নেয়া ছাড়া তার আর উপায় ছিল কি?

মিষ্টি চেহারার এরিকা শুধু মিষ্টভাষী নয়, তার হাবভাব এবং অঙ্গভঙ্গিতে এমন একটা মাধুর্য আছে যে কেউ একবার তার দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে পারে না। মার্কিন সমাজে কুমারী যুবতী দুর্লভ, অথচ এরিকা তাই। তাকে সামান্য একটা চুমো খাওয়ার ভাগ্য আজ পর্যন্ত কোন পুরুষের হয়নি।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিজের কথা নয়, এরিকার কথাই ভাবছে পল। এই উদ্ধার অভিযান কতখানি বিপজ্জনক ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না, এরিকার যদি কিছু ঘটে...

'তোমার কি মনে হয়, ক্যাপটেন ম্যাট ল্যান্ড করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল এরিকা, পলকে দুশ্চিন্তা-মুক্ত রাখতে চাইছে সে।

পলও ঠিক তাই চাইছে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। ওকে আমি চিনি, হার মানার লোক নয়। যতক্ষণ না এয়ারস্ট্রিপ দেখতে পায় চক্কর দিতেই থাকবে। পাইলট হিসেবে ওর জুড়ি মেলা ভার।'

কিন্তু পাইলটের কেবিনে পরিবেশটা থমথমে। ম্যাট ইসটন আশার কোন আলো দেখছে না। কুয়াশার ভেতর কোথাও কোন ফাঁক নেই, নিচে কোথায় কি আছে দেখবে কিভাবে? অসহায় বোধ করল সে। ওপর দিকে চাঁদের আলোয় সব পরিষ্কার, নিচে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ফুয়েল গজের দিকে তাকাল সে। প্রচুর রয়েছে। আরও অনেকক্ষণ চক্কর দিতে পারবে প্লেন। যখন দেখবে কার্টিস ফিল্ডে ফিরে যাবার মত ফুয়েল আছে, তখন ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত...

পাইলটের চিন্তায় বাধা পড়ল। এডওয়ার্ড ড্রেক, কো-পাইলট পাশ থেকে বলল, 'এখন আমারই সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই কি ল্যান্ডিং লাইট দেখেছিলাম আমি?'

‘মনে হচ্ছে ফিরে যেতে চাও, ড্রেক?’ কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল পাইলট। ‘আলোটা কি সত্যি দেখোনি?’

‘দেখেছি।’

‘ব্যস। চক্কর আমরা দিতে থাকব।’

আই.আই.ফাইভের বেস লীডার ড. কর্ডন সুইচ অন করার পর থেকেই একটা ল্যান্ডিং লাইটের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা। উদ্বেগে কাতর হয়ে আছে ও। কুয়াশার ভেতর ল্যান্ডিং লাইটটাকে সবুজাভ আভার মত লাগছে। এয়ারস্ট্রিপের কিনারায় ড. কর্ডনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, ঘাঁটির ঘরগুলো থেকে সিকি মাইল দূরে। উদ্বেগে কাতর আরও পাঁচজন লোক অপেক্ষা করছে ওখানে। হঠাৎ করে আবার শুনতে পাওয়া গেল ইঞ্জিনের অস্পষ্ট আওয়াজ। গুঞ্জনটা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,’ বিড়বিড় করল ড. কর্ডন। ‘ধরেই নিয়েছিলাম হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেছে।’

সত্যিই, মনে মনে রানাও ভাবল। একটু হলেও কুয়াশা যেন পাতলা হয়েছে। প্লেনটা শুধু একবার ল্যান্ড করতে পারলেই যথেষ্ট, তারপর আবার টেক-অফ করতে না পারলে না-ই পারল। কার্টিস ফিল্ডে জেনারেল ফচের সাথে কথা হয়েছে রানার, তখনই ওকে জানানো হয়েছে, একটা কোস্টগার্ড ডিটাচমেন্ট তৈরি হয়ে থাকবে। রানার বিশ্বাস, এই প্লেনের ডিটাচমেন্টের বারোজন সশস্ত্র লোক নিশ্চয়ই আছে। দলে ওই বারোজন যোগ হলে কে আর গ্রাহ্য করে কর্নেল বলটুয়েভকে। তখন দু’পক্ষের শক্তি প্রায় সমান সমান দাঁড়াবে।

‘কি মনে হয় আপনার, এই অবস্থায় ল্যান্ড করতে পারবে পাইলট?’ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ড. কর্ডন।

যেন কুয়াশায় চারপাশ ঢাকা ভৌতিক পরিবেশে জোরে কথা বলা মানা। বাতাস নেই বললেই চলে, অথচ কোথাও স্থির হয়ে নেই কুয়াশা। কখনও ঢেউ-এর মত এগিয়ে আসছে, কখনও ঢেউ ভেঙে গিয়ে পাহাড়, হাতি, তিমি, টাওয়ার, বিশাল দানব বা টানেলের আকৃতি নিচ্ছে। আর ঠাণ্ডা! গায়ে আগুন ধরার অভিজ্ঞতা আছে যার শুধু বুঝি তাকেই বোঝানো সম্ভব আর্কটিকের এই ঠাণ্ডার কি জ্বালা। বুটের ভেতর অনবরত পায়ের আঙুল নাড়াচাড়া করছে ওরা, তা না হলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু স্থির হয়ে নেই—হাত, পা, কোমর, ঘাড় সব সময় নাড়াচাড়ার মধ্যে রাখছে। খানিক পরই একেবারে মাথার ওপর চলে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ, সেই সাথে মনে হলো কুয়াশা যেন আরও একটু হালকা হয়েছে। ‘এখনও ল্যান্ড করার কথা ভাবছে না পাইলট,’ বিড়বিড় করল রানা। ‘ওপর থেকে কি দেখছে না দেখছে কে জানে…’

প্লেন নিয়ে আরও নিচে নেমে এসেছে পাইলট, পাঁচশো ফিট ওপর থেকে নিচটা আগের চেয়ে একটু ভাল দেখাল। দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ করে প্লেনের নাক আরও একটু নিচের দিকে তাক করল সে। শুধু কো-পাইলট ড্রেক পাইলটের এই আওয়াজের অর্থ জানে। বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ক্যাপটেন ম্যাট ইসটন। এ-ধরনের কোন ঝুঁকি নেয়ার সময় নিজের অজান্তেই আওয়াজটা বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে।

কুয়াশা হালকা হয়ে যাওয়ায় ল্যান্ডিং লাইট দেখতে পেয়েছে

পাইলট। জানে, এই শুভ পরিস্থিতির আয়ু বেশিক্ষণ নয়, যে-কোন মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র ঢেউ এসে আবার সব ঢেকে দিতে পারে। ক্ষীণ আলোর সমান্তরাল দুটো রেখা এতই অস্পষ্ট, মনে হলো চোখের ভুল। আর যদি চোখের ভুল না হয়, এয়ারস্ট্রিপটা কোথায় আন্দাজ করতে পারছে সে। যা থাকে কপালে, রেখা জোড়ার মাঝখানে ল্যান্ড করবে সে।

‘আমরা নামছি,’ শান্ত গলায় বলল সে। ‘ওদের জানাও।’

সীট ছেড়ে কার্গো কমপার্টমেন্টে ঢুকল কো-পাইলট, চোদ্দজন আরোহীকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘সীট-বেল্ট বাঁধুন, আমরা ল্যান্ড করতে যাচ্ছি...’

‘দেখলে তো, বলেছিলাম না?’ এরিকার হাতে চাপ দিয়ে বলল পল। ‘ক্যাপটেন ঠিকই ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।’ এরিকার দিকে ঝুঁকল সে খানিক, যেন মনে হলো চুমো খেতে যাচ্ছে। আশ্চর্য, সেটা ধরতে না পারলেও, নিজে থেকেই পলের দিকে মুখটা বাড়িয়ে দিল এরিকা।

প্রেমিকার কপালে আলতো করে ছোট্ট একটা চুমো খেলো পল। এরিকা রাঙা হয়ে উঠল, সরে বসল একটু, কিন্তু কেউ কারও চোখ থেকে দৃষ্টি ফেরাল না।

ওদিকে, কন্ট্রোল কেবিনে ঘামতে শুরু করেছে পাইলট ম্যাট ইসটন। প্লেনের ডানা একদিকে কাত করে নিয়ে আই.আই. ফাইভ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে। এয়ারস্ট্রিপের দিকে সরাসরি ফিরে আসবে, এটা তারই প্রস্তুতি। ল্যান্ডিং লাইট অদৃশ্য হলেও, মনে মনে প্রার্থনা করছে সে, অর্ধ বৃত্ত রচনা শেষ করে ফেরার সময় আবার যেন ওগুলো দেখতে পায়।

নিচে পোলার প্যাক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। প্লেন সিধে করে নিল ইসটন। কুয়াশার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ, শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাল সে। শালার আলোগুলো আগের চেয়েও অস্পষ্ট, মনে হলো তার। কুয়াশার অনেক নিচে ঝাপসা একটা ভাব, আলো কিনা বলা কঠিন। ডাইভ দিল প্লেন, ঝাপসা ভাবটুকু দ্রুত ছুটে আসছে কাছে। গিয়ার আর ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিয়েছে সে। দু'জোড়া প্রপেলার কুয়াশায় আলোড়ন তুলে ঘুরছে। এঞ্জিনের আওয়াজে কোন উত্থান বা পতন নেই। ঠিক এ-ধরনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আরও অনেক বার যেতে হয়েছে ক্যাপটেন ইসটনকে। আর্কটিকের বিভিন্ন অংশে আই.আই.ফাইভে পাঁচবার ল্যান্ড করেছে সে–প্রতিবারই এই অক্ষাংশ থেকে কয়েকশো মাইল উত্তরে।

সীমানা পেরোনো চলবে না!–নিজেকে সাবধান করে দিল ম্যাট ইসটন। ল্যান্ড করার জন্যে যথেষ্ট লম্বা এয়ারস্ট্রিপ, শুধু যদি ঠিক সময়ে টাচ ডাউন করতে পারে প্লেন। ঝাপসা ভাবগুলো হয়ে উঠল আভা–দু'সারি। মসৃণ বরফ স্পর্শ করল স্কিড। হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইল প্লেন, মনে হলো ডিগবাজি খেতে যাচ্ছে। তারপর মনে হলো স্কিডগুলো বরফের ওপর পিছলাতে শুরু করেছে। দু'সারি আভা দ্রুত বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে দু'পাশ দিয়ে, কিন্তু কোথায় কোন্ দিকে চলেছে প্লেন বোঝা যাচ্ছে না। সামনে যখন কোন বাধা নেই, কি আর বিপদ ঘটতে পারে! প্রপেলারের বাতাস খাবলা মারছে তুষারে, দু'পাশে মেঘের মত উড়ছে তুষারকণা, আভাগুলো ঢাকা পড়ে গেল। প্লেনের গতি মন্থর হয়ে এল। ব্রেক কষে এবার থামার প্রস্তুতি নিল পাইলট।

এয়ারস্ট্রিপের কিনারায় দাঁড়িয়ে রানা আর ড. কর্ডন এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেই বুঝল, পাইলট ল্যান্ড করতে আসছে। ‘পিছিয়ে আসুন,’ কথাটা শুনে রানার পিছু পিছু ছুটল ড. কর্ডন। এয়ারস্ট্রিপ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে এসে আবার যখন ওরা ঘুরল, প্রথমবারের মত প্লেনের আলো দেখতে পাওয়া গেল—ওদের দিকে ঝুঁকে আছে, স্লো-মোশান ছবির ভঙ্গিতে নেমে আসছে নিচে।

‘ঈশ্বর!’ গুঙিয়ে উঠল ড. কর্ডন। ‘স্ট্রিপের মাঝখানে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে, সীমানা পেরিয়ে যাবে!’

‘কি জানি!’ বিড়বিড় করল রানা। কুয়াশায় দূরত্ব আন্দাজ করা অসম্ভব। নিচে দাঁড়িয়ে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না, ওপর থেকে নিশ্চয়ই অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার, তা না হলে ল্যান্ড করতে আসত না পাইলট। ডানা দুটো দেখতে পেল রানা, প্রতিটিতে একটা করে আলো। দুই খুদে আলোর মাঝখানে গাঢ় একটা আকৃতি, এয়ারস্ট্রিপ ধরে তুমুল গতিতে ছুটে আসছে। নিস্তব্ধ আর্কটিক রাতে এঞ্জিনের আওয়াজ বিরতিহীন বিস্ফোরণের মত শোনাল। কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে প্রকাণ্ড দৈত্যের মত বেরিয়ে এল প্লেন। ওদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল স্ট্রিপের শেষ প্রান্তের দিকে। রানার যেন মনে হলো এঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে স্কিগুলোর হিসহিস শুনতে পেয়েছে ও।

কুয়াশার ভেতর আবার ঝাপসা হতে শুরু করল প্লেন। এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে যেতে শুনল ওরা। দু’এক মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়বে ওদের বাহন। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল পাইলট, প্রপেলারের আওয়াজ স্তিমিত হয়ে এল। এখনও ওরা প্লেনটাকে দেখতে পাচ্ছে, ঝাপসা, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

কাঠামোটা হঠাৎ করে বদলাল। বুকে হেঁটে এগোচ্ছিল প্লেন, হঠাৎ বরফে নাক দিয়ে খাড়া হয়ে গেল, আকাশ ছুঁতে চাইল লেজ। ভোজবাজির মত ঘটে গেল ঘটনাটা। আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল লেজ। সংঘর্ষের আওয়াজ আর ধাক্কায় বুটের তলায় ঝাঁকি খেলো বরফ। বিস্ফোরিত হলো পেট্রল ট্যাংক, তালা লেগে গেল কানে। কুয়াশার গাঢ় পর্দা চিরে বেরিয়ে এল আগুনের লকলকে শিখা, মুহূর্তের জন্যে ধাঁধিয়ে গেল রানার চোখ। তারপর শুধু আগুনের চড়চড় আওয়াজ, আর কালো ধোঁয়া।

বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি থামার পর স্নো-ক্যাটের জানালা খুলে পাইপ থেকে তামাক ফেলল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। 'কি, বলিনি, জুনায়েভ?' সহকারীর উদ্দেশে শান্ত, সন্তুষ্ট গলায় বলল সে, 'প্লেনে করে পালাতে পারবে না ওরা।'

একজনও বাঁচল না। এতই প্রচণ্ড তাপ, অল্প কিছুক্ষণের জন্যে কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে একটা টানেল তৈরি হলো, টানেলের শেষ মাথায় আকাশ আর চাঁদের হাসি। একটু পরই টানেলটা ভরে উঠল কালো ধোঁয়ায়। হিম কার্পেটের ওপর পুড়ে ছাই হচ্ছে প্লেনটা। হঠাৎ করেই নিভে গেল আগুন, থাকল শুধু কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ। পেট্রল, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, আর মাংস পোড়ার গন্ধে বমি পেল রানার।

ইতিমধ্যে ধোঁয়ার স্তম্ভটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিয়ে এসেছে রানা, ওর পিছু নিয়ে এতক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল ড. কর্ডন। 'কেউ নিশ্চয়ই বেঁচে আছে...'

‘কি করে আশা করেন!’

‘মি. রানা, এটা দেখুন…,’ কাঁপা গলায় বলল ড. কর্ডন, তেল মাখানো কি একটা তোবড়ানো জিনিস রয়েছে তার হাতে। জিনিসটার ভাঁজ খুলতেই চেনা গেল। নার্সরা পরে, একটা ক্যাপ। ‘প্লেনে একজন নার্সও আছে…’

‘ছিল।’

নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে চিৎকার করে উঠল ড. কর্ডন, ‘কেন, কেন? সবই তো ঠিক ছিল–স্ট্রিপে নিরাপদে নামব, স্পীড কমল, থামার ঠিক আগের মুহূর্তে কি এমন ঘটল যে…’

‘এদিকে আসুন।’ এয়ারস্ট্রিপ ধরে কয়েক পা এগোল রানা, ঝুঁকে বড়সড় একটা জিনিসের গায়ে হাত রাখল। জিনিসটা কি চেনা যাচ্ছে না, বরফে ঢাকা। কাছাকাছি স্কিড-এর দাগ দেখা গেল। ‘প্লেন ক্র্যাশ করার এটাই কারণ।’ সিধে হয়ে জিনিসটার গায়ে বুটের কয়েকটা লাথি মারল ও, বরফের আবরণ খসে বেরিয়ে এল পাথর। ‘এই বোল্ডারটায় ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেছে প্লেন।’ প্লেনের একটা স্কিড ওই ওদিকে পড়ে আছে, বোল্ডারের সাথে ধাক্কা লাগায় ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল।

কয়েক মুহূর্ত বোবা হয়ে থাকল ড. কর্ডন। তারপর অবিশ্বাস আর বিস্ময় ঝরে পড়ল তার গলা থেকে, ‘স্নো-প্লাউ দিয়ে মাত্র দু’দিন আগে স্ট্রিপ পরিষ্কার করেছি। আমি নিজে ছিলাম। ওটা ছিল না, থাকতে পারে না!’

‘শুধু এই একটাই নয়,’ বলে কয়েক পা এগিয়ে আরও একটা বরফ-ঢাকা বোল্ডার দেখাল রানা। হাত তুলে খানিক দূরে ড. কর্ডনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। ‘ওখানে আরেকটা।’

এয়ারস্ট্রিপের চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে তিন নম্বর বোল্ডারটাও দেখতে পেল ওরা। এগিয়ে গিয়ে সেটার ওপর ল্যাম্পের আলো ফেলল ড. কর্ডন। লাথি মেরে সেটার গা থেকে বরফ খসাল রানা। 'খুঁজলে হয়তো আরও পাওয়া যাবে, সবগুলো আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।' ড. কর্ডন রাগের সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলল রানা, 'কারণটা আর কিছুই নয়, স্ট্রিপ পরিষ্কার করার সময় ওগুলো এখানে ছিল না।'

'তারমানে আপনি বলতে চান...'

'হ্যাঁ। ক্যাম্পের পিছনের পাহাড়ে ছিল ওগুলো। পাথর তো আর সিকি মাইল পথ হেঁটে আসতে পারে না, কেউ ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছে। যদি কোন প্লেন ল্যান্ড করতে আসে, এই ভেবে। স্যাবোটাজ, ড. কর্ডন। আবার। আল্লাই জানে ক'জন ছিল প্লেনে।'

'বাস্টার্ডস!'

'শান্ত হোন। ক্যাম্পে ফিরে যাই চলুন।'

'আমেরিকার প্রতিটি খবরের কাগজে খবরটা যাতে ছাপা হয়...'

'বোকার মত কথা বলবেন না।' ড. কর্ডনের একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রানা। 'প্রমাণ কই?'

'কেন, বোল্ডারগুলো প্রমাণ নয়?'

'রাশিয়ানরা বলবে ওগুলো ওখানে আগে থেকেই ছিল—বাতাসের ধাক্কায় বরফ সরে যাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। ওরা বরং পাল্টা অভিযোগ করে বলবে, স্ট্রিপটা আপনারা ঠিকমত পরিষ্কার করেননি।'

'তারমানে আপনি বলতে চান...'

‘সম্পূর্ণ অন্য কথা। এ-ধরনের দুর্ঘটনার আয়োজন আরও করা হয়েছে কিনা দেখা দরকার।’

ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে ঘুরছে ক্যাটারপিলার ট্র্যাক। বরফে দাঁত বসিয়ে এগিয়ে চলেছে স্নো-ক্যাট। ক্যাবের সামনেটায় আলো ফেলছে একটা হেডলাইট, জানালার বাইরে বসানো দ্বিতীয় হেডলাইটের আলো তির্যকভাবে নিচের দিকটা আলোকিত করে রাখছে। বরফের ওপর তির্যক আলোটা যেখানে পড়ছে, সামনের দিকে ঝুঁকে সেদিকে তাকিয়ে আছে ড. কর্ডন। খানিক পর এই আলোটার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে তাকে। এই আলোই তাকে ঝপ করে বিশ ফিট নেমে যাওয়া খাদটা দেখতে পেতে সাহায্য করবে। খাদের নিচ থেকেই শুরু হয়েছে সীমাহীন পোলার প্যাক।

ফার পারকা আর ফার হুড পরে থাকায় এঞ্জিনের আওয়াজ তেমন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ড. কর্ডন। ঘড়ি দেখল, কাঁটায় কাঁটায় আটটা। সময়ের হিসেবে কোন ভুল হয়নি, নিজের হাতে অন করা এয়ারস্ট্রিপের ল্যান্ডিং লাইটগুলোর একটা দেখতে পাবার সময় হয়ে এসেছে। বড় লিভারটা ঘোরাল সে, ভারী ট্র্যাকের নাক একটু ঘুরে গেল। দিক বদলের সাথে সাথে চেক করল মাইলোমিটার। ড. কর্ডন শান্তিপ্রিয় মানুষ, কিন্তু বিপদের কথা মনে রেখে পাশের সীটে লোড করা একটা রাইফেল রাখতে হয়েছে তাকে। কুয়াশার ভেতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না, চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে নীল ক্যাপটা—কে জানে কেমন দেখতে ছিল নার্স মেয়েটা! চোখ আর ভুরু কুঁচকে তাকাল

সে। উইন্ডস্ক্রীন ঝাপসা হয়ে গেছে, পরিষ্কার করার বদলে গ্লাস আরও নোংরা করে তুলছে ওয়াইপার। ক্যাট থামিয়ে ন্যাকড়া হাতে নেমে পড়ল সে।

ঢেউ খেলানো কুয়াশা ভেসে যাচ্ছে স্নো-ক্যাটের ওপর দিয়ে, বাহনের পিছন দিকটা সম্পূর্ণ আড়ালে ঢাকা পড়ল। গ্লাসে ন্যাকড়া ঘষার সময় সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলাল ড. কর্ডন। চারদিকে কুয়াশা, কাছেপিঠে গোটা রাশিয়ান আর্মি লুকিয়ে থাকলেও দেখতে পাবার কথা নয়। তাড়াতাড়ি গ্লাস পরিষ্কার করে ক্যাবে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। খানিকটা হলেও স্বস্তি আর নিরাপত্তা বোধ ফিরে এল। মাইলোমিটার চেক করে বড় লিভারটা ঘোরাল, ধীরে ধীরে আবার এগোতে শুরু করল স্নো-ক্যাট। কাজটার বিপজ্জনক পর্যায় শুরু হলো এবার।

লিভারের ওপর ঝুঁকে তির্যক আলোর ওপর চোখ রাখল সে। হিসেব যদি ভুল না হয়ে থাকে, খাদের কাছাকাছি চলে এসেছে ক্যাট। প্ল্যানটা যদিও রানার, কাজটা সারার দায়িত্ব আর কাউকে না দিয়ে নিজে নিয়েছে ড. কর্ডন। স্নো-ক্যাটকে র‍্যাম্প পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে, র‍্যাম্প বেয়ে নামা হবে পোলার প্যাকে, তারপর বরফ-দ্বীপ আই.আই. ফাইভের পাশ ঘেঁষে প্যাক ধরে খানিকদূর, এই সিকি মাইলটাক, এগোনো। তির্যক আলোর সাহায্যে খাদের দিকে একটা চোখ রাখবে সে, তাতে সীমাহীন বরফ রাজ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয় থাকবে না।

এরপর স্নো-ক্যাট রেখে র‍্যাম্পের দিকে রওনা হবে ড. কর্ডন, পায়ে হেঁটে পোলার প্যাক থেকে ফিরে আসবে আই.আই. ফাইভে। স্নো-ক্যাট পোলার প্যাকে পড়ে থাকবে উত্তর দিকে মুখ

করে, স্টিয়ারিং মেকানিজম অকেজো অবস্থায়। রাশিয়ানরা ওটা দেখে ভাববে, দ্বীপ থেকে কেউ পালিয়েছে। ধরে নেবে প্লেনটা ক্র্যাশ করায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, তাই ভুল করে পশ্চিমের বদলে উত্তর দিকে গেছে ওরা।

এক হাতেই একটা সিগারেট ধরাল ড. কর্ডন, ভয় আর নিঃসঙ্গতা-বোধ একটু যেন দূর হলো। তারপর হঠাৎ করেই দিক বদল করল সে। তির্যক আলোয় খাদটা দেখতে পেয়েছে। দ্বীপ-প্রাচীরের কিনারা ঘেঁষে এগোল স্নো-ক্যাট। বিপদের ঝুঁকি এড়াবার জন্যে খাদের কিনারা থেকে বারো গজ সরে এল সে। এবার ক্যাবের মাথায় কাঠের থামে বসানো হেডলাইটের আলোয় সামনে, দূরে তাকাল সে। র‍্যাম্পটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে হবার কথা নয়।

'পুব…পুব…পুবদিকে! র‍্যাম্প, র‍্যাম্প!'

মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিল জুনায়েভ। বরফ-দ্বীপ আই.আই.ফাইভকে ঘিরে থাকা পোলার প্যাকে ওদের লোকজন রয়েছে, সাথে মার্কিন ধাঁচের ওয়াকি-টকি ট্র্যান্সমিটার। স্নো-ক্যাটটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে, এইমাত্র তাদের জানিয়ে দিল জুনায়েভ। এখন তারা কয়েক দিক থেকে স্নো-ক্যাট আর র‍্যাম্পের দিকে এগোবে।

কুয়াশার ভেতর স্থির হয়ে আছে কর্নেলের স্নো-ক্যাট। কর্নেলের পাশের সীটে রয়েছে জুনায়েভ। তাদের পিছনের কমপার্টমেন্টে, রাডার অপারেটর তার স্ক্যানার-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, দ্বীপের ওপর দিয়ে ড. কর্ডনের বাহনটাকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখছে সে। তার মাথার ওপর,

ছাদে, ধীরে ধীরে ঘুরছে রাডার উইং। পোলার প্যাকে মৃত্যুপুরীর জমাট নিস্তব্ধতা, দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে আই.আই. ফাইভের দিকে নির্ণিমেষ তাকিয়ে আছে কর্নেল বলটুয়েভ।

'আপনার কি মনে হয়, কর্নেল কমরেড, ইভেনকো ওদের সাথে যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল জুনায়েভ।

'বেকুব!'

'তা তো বটেই!' উত্তেজিত হয়ে উঠল জুনায়েভ। 'ব্যাটা ধরে নিয়েছে আমাদের চোখে ধুলো দেয়া খুব সহজ। বেঈমান, নেমকহারাম, ইহুদি জাতটাই...'

বাধা দিল কর্নেল, 'বেকুব আমি তোমাকে বলেছি, জুনায়েভ,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। আড়চোখে লক্ষ করল, হাঁ হয়ে গেল জুনায়েভের মুখ। 'ইভেনকো কোথায় তাই জানি না, জিজ্ঞেস করছ ওদের সাথে পালাচ্ছে কিনা!'

জুনায়েভ মাথা নিচু করে বসে থাকল।

আবার মুখ খুলল কর্নেল, 'ওদের সাথে থাকতে পারে সে, নাও পারে। যদি থাকে, সমস্যার সমাধান করা যাবে। যদি না থাকে, ওদের ছেড়ে যাওয়া ক্যাম্পে গিয়ে উঠব আমরা, অপেক্ষা করব তার জন্যে।' জানালা দিয়ে বাঁ দিকে তাকাল সে। কুয়াশা সরে যেতেই আরেকটা স্নো-ক্যাট দেখা গেল, চুপচাপ এঞ্জিন বন্ধ করে সেটাও স্থির হয়ে আছে। আরোহীর সংখ্যা আট, চারজনের কাছে রয়েছে অটোমেটিক উইপন। সময় দেখল কর্নেল। আটটা পাঁচ। আটটা পনেরোর মধ্যে দাবার বোর্ড থেকে আরও একটা ঘুঁটি তুলে নেয়া হবে, মুচকি হেসে ভাবল সে।

র‍্যাম্পে উঠে এল ড. কর্ডন।

সামনের ট্র্যাক নিচের দিকে ঝুঁকছে টের পেয়েই সাবধান হয়ে গেল সে। তিন বছর আগে পাহাড় থেকে পাথর এনে র‍্যাম্পটা তৈরি করেছিল তারা, পাথুরে অবলম্বনের ওপর দ্বীপ-প্রাচীরের গা ঘেঁষে ক্রমশ বাঁকা, চওড়া, এবং ঢালু হয়ে নেমে গেছে ওটা। ডান দিকে খাদ, আর কিনারা। ভারী বাহনটাকে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে ঘোরাল ড. কর্ডন, কাছাকাছি থাকল দ্বীপ-প্রাচীরের।

ব্রেক করল, এঞ্জিন চালু থাকল, বাইরে তাকাল জানালা দিয়ে। তির্যক আলোয় নিচে বা সামনে কোথাও কঠিন বরফের নাম-নিশানা নেই। ঢালু হয়ে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেছে র‍্যাম্প, মনে হলো পাহাড়ের কিনারা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দস্তানার ভেতর ঘামে চটচট করছে হাত। মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল। ঝুঁকিটা না নিলে কেমন হয়? এখানেই যদি ক্যাটকে ফেলে ফিরে যায় ক্যাম্পে?

রাশিয়ানদের বোকা বানানো কঠিন। নাহ্, নিখুঁত হওয়া চাই কাজটা।

'ধুস শালা, যা আছে কপালে!'

পোলার প্যাকে নিঃসঙ্গ দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এই অভ্যেসটা হয়ে গেছে, একা একা কথা বলা। বিপজ্জনক দিকটার সবকিছু আড়াল করে রেখেছে কুয়াশা। অপরদিকে, হেডলাইটের আলোয় ঝাপসা মত সাদাটে দেখা যাচ্ছে দ্বীপ-প্রাচীর। ওটার কাছ ঘেঁষে থাকতে হবে তাকে, খাদের দিকে তাকাবেই না।

ব্রেক ছেড়ে দিয়ে বাঁকা পথ ধরে এগোল ড. কর্ডন। নাজুক পরিস্থিতি, কারণ সামনের ক্যাটারপিলারগুলোকে অনুসরণ করে

পিছনের ট্র্যাকগুলোকে ঠিকমত বাঁক নিয়ে নেমে আসতে হবে। ঝাপসা বরফ-পাঁচিলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে। স্নো-ক্যাট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় সীটের কিনারায় ঝুলে মত আছে। স্নো-ক্যাটের ডান দিকের ট্র্যাক খাদের কিনারা থেকে এক ফুট দূরেও নয়। হামাগুড়ি দিয়ে, ধীরে ধীরে এগোল স্নো-ক্যাট, লিভারটা শক্ত করে চেপে ধরে আছে সে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিড়বিড় করল একবার, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ক্যাটের মতিগতি এখনও ঠিক আছে, সুন্দর নেমে যাচ্ছে র‍্যাম্প বেয়ে।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ক্যাট ঠিকভাবেই এগোচ্ছে, খাদের কিনারা থেকে দশ ইঞ্চি দূরে রয়েছে ডান দিকের ট্র্যাক। অথচ যা ঘটছে তাও দুঃস্বপ্ন নয়। ব্যাপারটা কেন ঘটছে, প্রথমে টেরই পেল না ড. কর্ডন। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত কাত হতে শুরু করল ক্যাট, উল্টে যাচ্ছে।

বরফই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল। অবলম্বন হিসেবে যে পাথরগুলো র‍্যাম্পের নিচে বসানো হয়েছিল, সেগুলোর নিচে ধসে যেতে শুরু করল বরফ। ক্যাটের অতিরিক্ত ওজন সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করল। কন্ট্রোল নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ড. কর্ডন, এমনি সময়ে কাত হয়ে গেল ক্যাট, কিনারা থেকে খসে পড়ল ঝুপ করে।

অনেকটা অভ্যাসবশত, কিনারা থেকে পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে, এঞ্জিন অফ করে দিল ড. কর্ডন। পরমুহূর্তে তার মাথা নিচের দিকে আর পা ওপর দিকে হয়ে গেল। বিশ ফিট নেমে এল ক্যাট, প্যাকের শক্ত বরফে পড়ল ছাদ, ভারী ট্র্যাক চ্যাপটা করে দিল খুদে ক্যাব। সেই সাথে ভেঙে চুরে, ফেটে, গুঁড়িয়ে চ্যাপ্টা

হয়ে গেল হাড়, মাংস, কাঁচ, আর ধাতু।

দ্বীপের অপর প্রান্তে, এক মাইল দূরে, ড. কর্ডনের এই করুণ পরিণতির কথা জানা হলো না রানার। নিজের দল নিয়ে দ্বীপ থেকে পোলার প্যাকে নেমে এসেছে ও। সপাং সপাং চাবুক খেয়ে ছুটছে কুকুরগুলো। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা।

দুই

দুনিয়াটা একদিন এরকমই দেখতে ছিল, ভবিষ্যতেও হয়তো কোন দিন এরকম দেখাবে। প্রাণহীন, বন্ধ্যা, জমাট বরফ–সূর্যের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা মৃত গ্রহ, অসীম শূন্যে নিঃসঙ্গ পথচারী। চারদিকে তাকিয়ে রানা যেন মানব-জাতির বিলুপ্তি চাক্ষুষ করল।

ক্ষীণ বাতাসের মৃদু নাড়া খেয়ে দক্ষিণ দিকে সরে গেছে কুয়াশা। ক্ষীণ কিন্তু হিমশীতল, সরাসরি উত্তর মেরু থেকে আসছে। কুয়াশা সরে যাওয়ায় জমাট বরফ রাজ্য চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে যতদূর দৃষ্টি চলে। কোথাও কিছু নেই, শুধু বরফ, আর বরফ। মরুভূমিতে কিছু না কিছু গজায়, নিঃসঙ্গ মরুদ্যান থাকে, দু'এক জায়গায় কাঁটা-ঝোপ দেখা যায়, কোথাও টলটল করে নীল গরম পানি। এখানে সে-সব কিছু নেই, আছে শুধু ঠাণ্ডা বরফ।

ওদের সামনে প্রেশার রিজ ঝুলে আছে, বালিয়াড়ির মত ঢেউ খেলানো, দশ থেকে বিশ ফিট উঁচু। নিয়াজের কম্পাসের ওপর বিশ্বাস রেখে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা। স্লেজ দুটোকে প্রাণপণে

টেনে নিয়ে চলেছে কুকুরগুলো। গন্তব্য সুদূর গ্রীনল্যান্ড, একশো মাইল দূরে। এখনও নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল নয় রানা, মাঝে মধ্যেই ঝোঁক চাপছে পশ্চিমের বদলে দক্ষিণে যায়। দক্ষিণে রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা—আইসবার্গ অ্যালি।

ঘণ্টাখানেক হলো পর্দা তুলে নিয়েছে কুয়াশা, এখনও রাশিয়ানদের ছায়া চোখে পড়েনি। হতে পারে কর্নেল বলটুয়েভের লোকজন এখনও হয়তো আই.আই. ফাইভের চৌহদ্দি পাহারা দিচ্ছে। ইভেনকো রুস্তভ আসবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে। স্লেজ চালাবার ফাঁকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা, ছুটে তার পাশে চলে এল নিয়াজ। 'ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারের খবর কি, নিয়াজ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মহাশয়ের পশ্চাদ্দেশে বোধহয় ব্যথা,' ফাজলামি করে বলল নিয়াজ। 'তুমি জেরা করার পর সেই যে হাউকাউ শুরু করেছেন, থামাথামি নেই। বিনয়ের স্লেজে এমন ভঙ্গিতে বসে আছেন, যেন চেঙ্গিস খান। তোমার অনুমতি পেলে মনের খানিকটা ঝাল মেটানো যেত।'

'পরে। জানো তো না কি উপাদানে তৈরি, ঘাঁটালে পিছিয়ে দেবে আমাদের।' হঠাৎ আকাশের দিকে তাকাল রানা। উত্তর-পুব থেকে গাঢ় একটা আলোক বিন্দু এগিয়ে আসছে, সোজা ওদের দিকে। কুৎসিত একটা পাখির মত রাতের আকাশ চিরে আসছে ওটা, এখনও এত দূরে যে রোটর ডিস্ক দেখা গেল না বা এঞ্জিনের আওয়াজও শোনা গেল না।

'হেলিকপ্টার! গেট আন্ডার কাভার...!' একই সাথে সপাং করে উঠল রানার হাতের চাবুক। জোরে, আরও জোরে ছুটল

কুকুরগুলো, যেন বুঝতে পেরেছে সামনের প্রেশার রিজগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিতে হবে।

বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল নিয়াজ। ইভেনকো রুস্তভকে স্লেজ থেকে নেমে ছুটতে বলছে সে। ইহুদি ভদ্রলোক চলন্ত স্লেজ থেকে নামতে গিয়ে বরফের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কেউ তাঁকে সাহায্য করার নেই, সবাই তাঁকে ফেলে এগিয়ে গেছে, নিজের ভাষায় অভিশাপ দিতে দিতে দাঁড়ালেন তিনি, লম্বা পা ফেলে ছুটলেন। দ্রুত এগিয়ে আসছে যান্ত্রিক ফড়িং, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে এঞ্জিনের আওয়াজ। প্রথম বরফ-পাঁচিলের একটা ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে গেল রানার স্লেজ, একটা করিডরের ভেতর থামল কুকুরগুলো। পিছু পিছু করিডরে ঢুকল বিনয়ের স্লেজ, রুশ বিজ্ঞানী তখনও উন্মুক্ত বরফ প্রান্তরে, অথচ একেবারে কাছে চলে এসেছে রাশিয়ান হেলিকপ্টার। দাঁড়িয়ে পড়ল নিয়াজ, জানে, প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। ইভেনকো রুস্তভের হাত ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিল সে, তাকে নিয়ে ছুটল আবার। বরফ-পাঁচিলের কাছাকাছি এসে পিঠে ধাক্কা খেলেন ওশেনোগ্রাফার। নিরাপদ আড়ালে ছিটকে পড়লেন তিনি।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই, কুকুরগুলো পর্যন্ত মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে–হাঁপাচ্ছে।

খুব নিচে দিয়ে উড়ে আসছে রুশ ফড়িং, পাঁচিলের জন্যে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। বেশি হলে বরফ থেকে দুশো ফিট উঁচুতে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। পনেরো ফিট উঁচু বরফ-পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, পাঁচিলের মাথা ওদের দিকে ঝুলে আছে ভাঙতে শুরু করা

ঢেউয়ের মত। এঞ্জিনের আওয়াজ এখনও বাড়ছে, নালার ভেতরটা কাঁপছে। হঠাৎ ঝামেলা শুরু করল বিনয়ের একজোড়া কুকুর। এই আওয়াজের ওপর ওদের ঘৃণা থাকা স্বাভাবিক, কারণ হেলিকপ্টারই ওগুলোকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কুয়াশার কিনারায়। লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সামনে ছুটতে চাইল কুকুর দুটো, রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে চায়। একটার মাথায় প্রচণ্ড এক থাবড়া মারল বিনয়, ঝট্ করে বিনয়ের দিকে ঘুরল সেটা, ভীতিকর ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে। করিডরের ভেতর কুকুরগুলো ছুটোছুটি করলে ওপর থেকে ওগুলোকে দেখা যাবে। কিছু নড়াচড়া করলে সেটাই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে।

উদ্বেগের সাথে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, নিজের টীম ছেড়ে নড়তে পারছে না। পরবর্তী দৃশ্যটা বিস্মিত করল ওকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ইভেনকো রুস্তভ, হাত বাড়িয়ে বিদ্রোহী কুকুরটার গলায় হাত বুলাল, রুশ ভাষায় বিড়বিড় করে কি যেন বলে অভয় দিল সেটাকে। শান্ত হয়ে গেল কুকুরটা, তার অপর সঙ্গী আদরটুকুতে ভাগ বসাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় করিডরের ওপর দিয়ে ছুটে গেল একটা ছায়া।

এতক্ষণ উদ্বেগ ছিল, এবার বাসা বাঁধল ভয়। নিজেদের অজান্তেই আবার দম বন্ধ করল ওরা। এমনকি কুকুরগুলোও চুপ হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ স্থির। হেলিকপ্টার দেখেনি কেউ, দেখেছে তার ছায়া। মনে হলো পশ্চিম দিকে উড়ে গেল সেটা। 'আমি না ফেরা পর্যন্ত নড়বে না কেউ,' নির্দেশ দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল রানা। খানিক দূর হেঁটে এসে থামল ও, পাঁচিলের মাথা এখানটায় বেঁকে নেই। বরফের গায়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে, ফাটলে পা বাধিয়ে উঠে পড়ল

চূড়ায়।

নজর রাখার জন্যে আদর্শ একটা জায়গা। ওর সামনে আরও অনেক প্রেশার রিজ ঢেউ খেলে রয়েছে, নিচুগুলোর ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে। আধ মাইল পর আবার শুরু হয়েছে সমতল বরফ। স্লেজ চলবে ওখানে চমৎকার, কিন্তু পথে রাশিয়ানরা রয়েছে।

দলগুলো ছোট ছোট, কিন্তু সংখ্যায় বারোটা, একটার কাছ থেকে আরেকটা যথেষ্ট দূরে। বিস্তীর্ণ বরফ প্রান্তরের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা, বহুদূর গ্রীনল্যান্ডের দিকে। দলগুলোর সামনে, একজোড়া হেলিকপ্টার উড়ছে। রানা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একটা কপ্টার ল্যান্ড করল সমতল বরফে, একটা স্লেজ টীমের কাছাকাছি। রোটর থামার আগেই হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল কুকুর। পিছু পিছু নামল লোকজন আর স্লেজ। ওদের কাজ সারার নৈপুণ্য আর দ্রুতগতি দেখে একরকম মুগ্ধই হলো রানা। দশ সেকেন্ড হয়েছে উঁকি দিতে শুরু করেছে ও, আবার আকাশে উঠে পড়ল হেলিকপ্টার, কোর্স বদলে ফিরে চলল উত্তর-পুবে। করিডরে নেমে, সবার কাছে ফিরে এল রানা। প্রায় সাথে সাথেই ঝড় শুরু হলো—বিতর্কের!

'যাক বাবা, ওরা আমাদের দেখতে পায়নি,' হাঁফ ছাড়ল বিনয়। মৃদু হাসল রানা।

'ওদের আসল কাজ ছিল আরও স্লেজ টীম নামানো।'

রানার দিকে একটা আঙুল তাক করল নিয়াজ। 'মূর্তিমান দুঃসংবাদ।'

'আরও স্লেজ!' বিনয় হতভম্ব।

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘পশ্চিম দিকে, আধ মাইলও হবে না, বারোটা পর্যন্ত সার্চ টীম গুনেছি। মাথার ওপর টহলে রয়েছে হেলিকপ্টার।’

‘এদিকে আসছে?’

মাথা নাড়ল রানা।

বিনয় জোর দিয়ে বলল, ‘তাহলে আমরা ওদের পিছু পিছু, আস্তে-ধীরে যেতে পারি, কি বলো?’

আবার মাথা নাড়ল রানা। ‘প্যাকের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় খোলা, সমতল মাঠ দেখেছিলাম, মনে আছে? ওই মাঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে ওরা। ওটা পেরোতে গেলেই দেখে ফেলবে। তারপর কি হবে ভাবতে পারো?’

‘দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে বলটু,’ মন্তব্য করল নিয়াজ।

অনিদ্রায় ক্লান্ত, প্লেন দুর্ঘটনার দৃশ্য এখনও ভুলতে পারেনি, তিক্তমেজাজ নিয়ে রানার সামনে দাঁড়াল বিনয়। ‘তুমি ভুল করছ, রানা,’ শান্ত সুরে বলল সে। ‘শুধু পশ্চিম দিকেই নিরাপদ আশ্রয় পাব আমরা। বাঁচতে হলে গ্রীনল্যান্ড উপকূলে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। একবার পৌঁছুতে পারলে আর কোন ভয় নেই। রাশিয়ানরা তো আর গ্রীনল্যান্ড আক্রমণ করতে পারবে না।’

‘নিখুঁত প্ল্যান,’ বলল রানা। ‘শুধু...’

‘ভুলে যাওয়া হচ্ছে,’ রানার কথা কেড়ে নিয়ে বলল নিয়াজ, ‘রাশিয়ানরা পথে বাধা দেবে আমাদের।’

‘বরফের মাঠটা বিশাল, ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব,’ যুক্তি দেখাল বিনয়।

‘হয়তো,’ বলল রানা। ‘কিন্তু হেলিকপ্টারগুলোকে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘তাহলে তুমিই বলো কি করব আমরা?’ ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল বিনয়। ‘উত্তর দিকে গিয়ে ব্লাডি পোলে মারা পড়ব? পুবে গিয়ে আই.আই.ফাইভে কয়েদ হব, বলটু যেখানে অপেক্ষা করছে? দক্ষিণে...’

‘দক্ষিণে,’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘হ্যাঁ।’

এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সাথে ওদের কথাবার্তা শুনছিল ইভেনকো রুস্তভ, হঠাৎ খুব ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ‘দক্ষিণে? এ তো স্রেফ পাগলামি...!’

‘আপনার সাথে কেউ আলোচনা করছে না,’ বিরক্তিভরে হাত ঝাপটা মেরে বলল বিনয়। রানার দিকে ফিরল আবার। ‘দক্ষিণে গেলে সোজা আইসফিল্ডের কিনারায় গিয়ে পৌঁছুব আমরা, সোজা আইসবার্গ-অ্যালিতে। তারপর? স্লেজ পানিতে ভাসে কিনা আমার অন্তত জানা নেই।’

মাথা নাড়ল নিয়াজ। ‘মাফ চাই, বাবা, এর উত্তর দেয়ার সাধ্য আমার নেই।’

‘মাথা ঠাণ্ডা করো, বিনয়,’ বলল রানা। ‘আইসব্রেকার কিউটে চড়ব আমরা। এরই মধ্যে আইসবার্গ অ্যালির দিকে রওনা হয়ে গেছে ওটা। এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে ভেবে জেনারেল ফচের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থাটা আগেই করে রাখা হয়েছে।’

বিমূঢ় হয়ে পড়ল বিনয়। ‘তুমি সত্যি বিশ্বাস করো কিউটের দেখা পাব আমরা?’

‘টেস্থ্ মেরিডিয়ান ধরে আসছে কিউট, নিজেদের পজিশন চেক করার জন্যে বার কয়েক তারাগুলোকে দেখে নিতে হবে।’ কথা শেষ করে নিজের টীম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা, যেন আর কোন আলোচনা নেই।

‘দোস্ত বিনয় কি ফিউজ হয়ে গেল?’ কৌতূহল প্রকাশ করল নিয়াজ।

না, বিনয়ের কথা এখনও শেষ হয়নি। ‘তুমি এমন সুরে কথা বলছ, রানা, আমরা যেন ঢাকা থেকে গারো পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছি। তুমি ভাল করেই জানো, স্টার-ফিক্স নিখুঁত হয় না। ব্যাপারটা দাঁড়াবে অনেকটা যেন–এক পিনের মাথা আরেক পিনের মাথাকে খুঁজছে, মাঝখানে প্রায় একশো মাইল ফারাক।’

আরেকটু হলে হাততালি দিয়ে ফেলেছিল নিয়াজ। ‘তর্কবাগীশ বিনয়ের জুড়ি মেলা ভার।’

হাত তুলে নিজের স্লেজটা দেখাল রানা। ‘বিজ্ঞানের সামান্য একটু সাহায্য পাব আমরা। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমাদের সাথে ইলিয়ট হোমিং বীকন রয়েছে। কিউট রেঞ্জের মধ্যে এসে গেলে রেডিফন সেট অন করে সিগন্যাল পাঠাব। কিউটে হেলিকপ্টার আছে, সিগন্যাল অনুসরণ করে আমাদের কাছে চলে আসবে ওটা। এবার সন্তুষ্ট?’

‘ব্যাপারটা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না,’ মুখ ভার করে বলল বিনয়। নিয়াজের দিকে ফিরল সে। ‘তুমি কি বলো?’

‘সবিনয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই,’ বলল নিয়াজ। ‘আলোচনা শুরুর আগে, রানা সবচেয়ে খারাপ কি করবে বলে ভেবেছিলে তুমি?’

'দক্ষিণ দিকে যেতে চাইবে...'

'কাজেই বলটুও ঠিক তাই ভাববে,' বলল নিয়াজ। 'অর্থাৎ আমরা দক্ষিণ দিকে যেতে পারি এ-সম্ভাবনা তার মাথাতেই আসবে না।'

দস্তানা পরা হাত কচলাচ্ছে ইভেনকো। হঠাৎ রাগে বিস্ফোরিত হলো। 'আপনার মধ্যে, মি. মাসুদ রানা, এ-ধরনের পাগলামি আমি আশা করি না!'

'প্রতিভাবানরা একটু পাগলাটেই হয়,' ফোড়ন কাটল নিয়াজ। 'আপনি নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারেন না?'

নিয়াজের কথায় কান না দিয়ে রানাকে আবার বলল ইভেনকো, 'মিস্টার মাসুদ রানা, আপনার ওপর আমার আস্থা আছে, কিন্তু...'

'যদি অনুমতি দেন, ভুলটা সংশোধন করতে চাই,' আবার নিয়াজই মুখ খুলল। 'আসলে আপনি আস্থা এনেছেন আমেরিকানদের ওপর...'

'তা সত্যি,' স্বীকার গেল ইভেনকো। 'মুক্ত দুনিয়া বলতে তো আমেরিকাকেই বোঝায়। কিন্তু মিস্টার মাসুদ রানার ওপরও আমার আস্থা আছে।'

'আচ্ছা, বলুন তো, বাংলাদেশ কোথায়?' সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল বিনয়।

মুখ খুলল ইভেনকো, তারপর আবার বন্ধ করল।

'ঠিক আছে, বলুন তো, আপনার হিরো কোথায় মানুষ হয়েছে?'

'অবশ্যই আমেরিকায়,' বেশ জোর দিয়ে বলল ইভেনকো।

'তা না হলে...'

নিয়াজ হাসল। 'আপনি বিশাল সমুদ্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বাংলাদেশ বা রানা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। আপনি জানেন না, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পিছনে আমেরিকার কোন অবদান ছিল না, বরং রাশিয়ার ছিল। যার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না, তার ভক্ত হন কিভাবে? কিভাবে সে আপনার হিরো হয়? আসলে আমার কথাই ঠিক, আপনি আমেরিকার ভক্ত। রানা আমেরিকানদের পোষ্য ধরে নেয়ায় তারও আপনি ভক্ত হয়ে পড়েছেন।'

ম্লানমুখে ইভেনকো বলল, 'মি. রানা, আপনার সহকারী আমাকে সম্ভবত অপমান করছেন...'

তার এই অভিযোগের উত্তরে কেউ কিছু বলল না। বিনয় বলল, 'আমেরিকাকে তো চেনেন না, ওখানে কিছু দিন থাকলে টের পাবেন...'

'আমেরিকা এতই যদি খারাপ, আপনারা তাহলে তাদের কথামত আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছেন কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ইভেনকো।

'আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে,' বলল নিয়াজ। 'কাজটা আমরা নিতে চাইনি।'

'অন্যান্য আরও কারণও আছে,' বলল বিনয়, 'সব আপনাকে জানানো সম্ভব নয়।' এক সেকেন্ড থেমে আবার বলল সে, 'দক্ষিণে যেতে আপত্তি থাকলে ফিরতি পথ ধরে লেনিনগ্রাদে ফিরে যেতে পারেন আপনি। আপনার জন্যেই একের পর এক বিপদে পড়তে হচ্ছে আমাদের। আমাদের লীডার যা বলেছে তাই হবে। দক্ষিণেই

যাব আমরা।'

তাড়া লাগিয়ে কুকুরগুলোকে দাঁড় করাল বিনয়, পিঠে চাবুকের বাড়ি খেয়ে রানার স্লেজকে অনুসরণ করল ওগুলো। পাঁচ মিনিট এগোবার পর নব্বুই ডিগ্রী বাঁক নিল ওরা। সমতল বরফ প্রান্তর ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল। একনাগাড়ে দু'ঘণ্টা ছুটল স্লেজ। নালা আর প্রেশার রিজ পেরোল একের পর এক। তারপর কিছু সময়ের জন্যে বিরতি। আগেই ঠিক করা ওয়েভলেন্থে সিগন্যাল পাঠাল নিয়াজ, এই সিগন্যালের জন্যে কার্টিস ফিল্ডে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জেনারেল ফচ।

'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট...পেলিকান...ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট...পেলিকান...'

কার্টিস ফিল্ড থেকে উত্তর পাবার জন্যে পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরতে হলো। এতটা সময় লাগায় ঝুঁকির পরিমাণ বাড়ল বৈকি, কারণ রুশ ঘাঁটি এন.পি. সেভেনটিনের মনিটর সেট রেডিওর অস্তিত্ব ও অবস্থান জেনে নিতে পারবে—অন্তত পাঁচ মিনিটের মধ্যে জেনে নেয়া উচিত। ঝুঁকিটা না নিয়েও কোন উপায় ছিল না। পেলিকান শব্দটা দিয়ে জেনারেল ফচকে জানিয়ে দেয়া হলো ইভেনকো রুস্তভ এখন রানার হাতে, ওয়াশিংটন সিটি ব্যাংকে রানা এজেন্সির অ্যাকাউন্টে এক বিলিয়ন ডলার জমা দিতে হবে। টাকাটা জমা পড়ল কিনা সে-খবর সময় মত পেয়ে যাবে রানা, সে-ব্যবস্থা করাই আছে। আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শব্দের মানে, ওরা দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। রেডিফন এরিয়াল নামিয়ে সেটের ভেতর ঢোকাল নিয়াজ, তারপর আকাশের দিকে তাকাল।

'দু'ঘণ্টার ভেতর কোন রাশিয়ান প্লেন দেখিনি,' বলল সে।

বিনয়ের স্লেজ থেকে কথা বলল ইভেনকো, 'আমেরিকান প্লেনও।'

'আমেরিকান পাইলটরা শীতের ছুটিতে দেশে ফিরে গেছে,' বলল নিয়াজ। 'কিউটের ক্যাপটেন না গেলেই বাঁচি।'

*

'...আর্জেন্ট ইউ পেনিট্রেট আইসফিল্ড ফর পসিবল রন্ডিভো। ম্যাক্সিমাম রিস্ক মাস্ট বি অ্যাকসেপ্টেড। রিপিট। মাস্ট বি অ্যাকসেপ্টেড।'

ওয়াশিংটন থেকে তিন দিন আগে পেলেও, এখনও মেসেজটাকে সহজভাবে নিতে পারছেন না ইউ.এস. নেভীর কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান। ছ'হাজার পাঁচশো পনেরো টনী আইসব্রেকার কিউটের ক্যাপটেন তিনি। যতই তিনি ভাবছেন, মেসেজের শেষ অংশটুকু ততই তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। চরম ঝুঁকি নিতে হবে কথাটার মানে কি? এদিকের পানিতে আসা মানেই তো চরম ঝুঁকি নেয়া! নাকি ওয়াশিংটনে বসে কর্তা ব্যক্তিরা ভাবেন বরফে চাপা পড়ে বা আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ না ডোবা পর্যন্ত প্রমাণ হয় না যে চরম ঝুঁকি নেয়া হয়েছে?

তেতাল্লিশ বছর বয়স ক্যাপটেনের, পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি লম্বা, চওড়া কাঁধ, চুল আর ভুরু কুচকুচে কালো। ভাবলেশহীন চেহারা, যদিও গম্ভীর দেখায় না। ক্ষীণ একটু হাসির রেখা দেখা যায় শুধু যখন ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে পড়েন। তখন তাঁর গলাও শুকিয়ে যায়, বিয়ারের ক্যান খুলতে হয় দু'চারটে।

'একটু দেখবেন, স্যার?' কেন্ রাসেল, মেট, রাডারস্কোপ-এর সামনে থেকে এক পা পিছিয়ে এসে কোটের কলার তুলে দিল

ঘাড়ে। কিউটের উঁচু ব্রিজ গরম রাখার জন্যে হিটিং সিস্টেম আছে, কিন্তু সিস্টেমে বোধহয় কোন গোলযোগ দেখা দিয়েছে। আর্কটিক আবহাওয়াই বোধহয় দায়ী। খোলা ডেকে অমানুষিক পরিশ্রম করছে একদল লোক, কোদালে বরফ তুলে জাহাজের কিনারা দিয়ে নিচে ফেলছে। যত ফেলছে ততই আবার জমছে, যেন ভোজবাজির মত বাতাসই হয়ে উঠছে নিরেট বরফ। সান্ত্বনা এইটুকুই যে সমস্ত বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে আইসব্রেকার। আর্কটিক সাগরের ভাসমান বরফখণ্ড তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

ইচ্ছে করছে না, তবু রাডারস্কোপে চোখ রাখলেন কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান। তিন ঘণ্টা আগে শেষবার যখন রাবার হুডের ভেতর মাথা গলিয়ে তাকিয়েছিলেন, স্কোপে ব্লিপ দেখা গিয়েছিল। দূরত্ব আর দিক হিসেব করে বুঝতে অসুবিধে হয়নি, ব্লিপগুলো কোন জাহাজের নয়। উত্তর-পশ্চিম আর উত্তর-পুবে কোন জাহাজ থাকতে পারে না। এবার কোন ব্লিপ দেখা গেল না। নিরেট, নিভাঁজ বরফ-রাজ্যে সব কিছুই যেন স্থির।

'ব্যারিয়ার,' কোন দরকার ছিল না, তবু বলল কেন্ রাসেল। 'একেবারে সামনে।'

মেসেজের শেষ অংশটার কথা আবার মনে পড়ে গেল কমান্ডারের।

ব্লিপ দেখতে না পাবার এটা একটা কারণ, জানেন তিনি—এই ব্যারিয়ার। আইসফিল্ডের নিরেট একটা পাঁচিল কিউটের পথে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। ভাসমান বরফখণ্ডগুলোকে দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই পাঁচিলের দিকেই এগোচ্ছে

আইসব্রেকার। স্পিটবার্জেন থেকে গ্রীনল্যান্ড পর্যন্ত লম্বা এই পাঁচিল। মুশকিল হলো, যেভাবে হোক আইসফিল্ডে ঢোকার জন্যে একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে তাদের। আইসফিল্ড সী লেভেল থেকে সামান্য একটু উঁচু কি উঁচু নয়, এরকম একটা জায়গা চাই। সামান্য উঁচু হলে কিউটের বো বরফ ভেঙে ঠিকই ঢুকে যাবে ভেতরে। আশার কথা এইটুকু, সামনে কি আছে দেখার জন্যে রাডার রয়েছে তাঁদের। মনে মনে প্রার্থনা করলেন তিনি, ঈশ্বর, কুয়াশা দিয়ো না।

দু'ঘণ্টা পর আইসফিল্ড থেকে ধোঁয়ার মত কুয়াশা উঠতে শুরু করল। ব্রিজের সামনে, ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেলে তাকিয়ে আছেন কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান, পালা করে ঘন ঘন সামনে আর ডেকের দিকে তাকাচ্ছেন। দুটোর একটা দৃশ্যও তাঁকে উৎসাহিত করল না। ফোর-পীকে দ্রুত বরফ জমছে, নতুন একটা দল হেরে যাওয়া যুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে তবু। বরফ ঢাকা রেইলের ওপর দিয়ে গুঁড়ো বরফ ফেলছে তারা, যতটুকু ফেলছে তারচেয়ে জমছে বেশি। শূন্য থেকে টেমপারেচার পঞ্চাশ ডিগ্রী নিচে।

'পোলার বেয়ার…!'

ব্রিজ থেকে স্টারবোর্ড সাইডে বরফ-প্রাচীরের মাথায় তাকিয়ে আছে মেট কেন্ রাসেল। ব্রিজের মতই উঁচু পাঁচিলটা, মাত্র কয়েক কেব্‌ল্ দূরে। নিচের ফোর ডেক থেকে মখ তুলে তাকাল লোকজন, পাঁচিলটাকে মনে হলো কোন দালানের খাড়া গা। চাঁদের আলোয় তিনটে ঝাপসা হলদেটে মূর্তি তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। আইসফিল্ডের কিনারায় তিনটে পোলার বেয়ার, কূকের সদ্য ফেলা

আবর্জনার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে উঠে এসেছে পাঁচিলের মাথায়।

খুব ধীরে চলছে এঞ্জিন, কিন্তু আওয়াজটা জোরাল আর নিয়মিত, বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তির লাগাম টেনে রাখা হয়েছে। এঞ্জিন ঠিক থাকলে যত বিপদই আসুক, তোয়াক্কা করেন না কমান্ডার। কিন্তু সামনের দৃশ্য তাঁর মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিয়েছে। ‘রাসেল, খাঁচায় উঠে যাও। ওপর থেকে তাকালে তবে যদি ভেতরে ঢোকার পথ চোখে পড়ে।’ নির্দেশটা তিনি অনিচ্ছার সাথে দিলেন।

অনিচ্ছা নিয়েই একশো ফিট উঁচু মই বেয়ে খাঁচায় উঠে গেল মেট। মাস্তুলের মাথায় এটা কিউটের অবজারভেশন পোস্ট। কুয়াশা উঠছে, নিচের দিকে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রী, এই পরিস্থিতিতে আসমানের ওপর এই ঠাঁই নরকের চেয়ে কম কিসে। ছোট্ট একটা ঘর, চামড়া-মোড়া টুলে বসল রাসেল। বিয়ের পরদিন জরুরী ডাক পেয়ে কিউটে চড়ে সাগরে ভাসতে হয়েছে তাকে। বন্দরে ফিরে যাচ্ছিল, এই সময় আবার জাহাজের কোর্স বদলাবার আদেশ পায় ওরা। বন্দরে আর ফেরা হলো না। অথচ নতুন বউ বসে আছে ওর পথ চেয়ে। ক্যাপটেনের মতই, মাসুদ রানা নামের অচেনা লোকটাকে বিশেষ পছন্দ করতে পারছে না রাসেল।

ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেলে চোখ রেখে দ্রুত একবার সামনেটা দেখে নিল সে। মাথায় হারনেস গলাল, অ্যাডজাস্ট করল মাইক, তারপর কথা বলল ব্রিজের সাথে, ‘পজিশনে, স্যার। সামনে বড় একটা আইসবার্গ।’

‘দেখেছি আমরা,’ তার বেয়ে কমান্ডারের গলা ভেসে এল। ‘ঢোকার কোন পথ দেখছ?’

‘কোথায়! পাথুরে পাহাড়ের মত নিরেট, স্যার।’

‘দেখতে থাকো।’

খাঁচার ভেতর নিরাপদ সে, জানে রাসেল, তবু নানা রকম ভয় এসে ঝামেলা করতে লাগল। মাস্তুলটা যদি ভেঙে পড়ে? চোখ বুজল সে, সরাসরি নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরছে। হঠাৎ যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে? লোহার মই বেয়ে কোন রকমে একজন লোক উঠতে পারে, সে কি কাঁধে করে নামাতে পারবে অসাড় ভারী একটা দেহ? জোর করে চোখ মেলল সে, হাত বাড়িয়ে কাঁচের দেয়ালগুলো ছুঁয়ে আশ্বস্ত হতে চাইল। ব্রিজে থাকতে মনে হয়েছিল হিটিং সিস্টেম ভালমত কাজ করছে না, আর খাঁচায় ওঠার পর মনে হচ্ছে সিস্টেমটা কোন কাজই করছে না।

ডেক থেকে একশো ফিট ওপরে রয়েছে সে, চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেল। জাহাজ চলছে বলে মনেই হয় না। ভাসমান বরফ আকারে এক একটা বাড়ি, ওপর থেকে জমাট চিনির বিরাট স্তূপের মত দেখতে লাগল। কিউটের বো ধাক্কা দিয়ে স্তূপগুলোকে ভাঙছে, ভাঙা টুকরোগুলো দু'পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে আইসব্রেকারকে। আরও সামনে ঝুঁকে আছে দৈত্যাকার পাঁচিল, মাথার দিকে তাকাতে হলে মুখ তুলতে হচ্ছে রাসেলকে। আপাত দৃষ্টিতে অচল, যেন সাগরতলে নোঙর ফেলে আছে। কিন্তু আইসবার্গ থেমে নেই, ভেসে চলেছে দক্ষিণ দিকে। উল্টো দিকে, উত্তরে চলেছে কিউট।

প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাঁ দিকে ঝুঁকে দু'পাশে তাকাল রাসেল। ওর ওপরে, বড়সড় রাডার উইং সমান গতিতে ঘুরে চলেছে, অনবরত ওয়ার্নিং ইকো ট্র্যান্সমিট করছে ব্রিজের হুড

পরানো স্কোপে। স্টারবোর্ডের দিকে ধীরবেগে পিছিয়ে যাচ্ছে বরফ-পাঁচিল। পাঁচিলের মাথা থেকে পোলার বেয়ারগুলো অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে। নিচের ডেকে এত বেশি বরফ যে জাহাজ প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, সাগর আর জাহাজের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। সুইচ অন করে মেসেজ পাঠাল সে, 'ঘন কুয়াশা আসছে, স্যার। সিকি মাইল দূরে, নাক বরাবর।'

ত্রিশ মিনিট পর, এক অর্থে, সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেল রাসেল। ঘন কুয়াশায় কিছুই সে দেখতে পেল না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কামড় খেয়ে হাত আর পায়ে যে অসাড় ভাব দেখা দিয়েছিল, সেটা এখন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। রক্ত চলাচল চালু রাখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, জগিং শুরু করল। কাঁচের দেয়ালগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে। বাইরের কিছু দেখার একটাই মাত্র উপায় আছে, ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেল। কিন্তু প্যানেলে তাকিয়ে কুয়াশা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল তার। নিচে তাকিয়ে ডেক দেখতে চেষ্টা করল। নেই।

ভয় হতে লাগল, কোথায় রয়েছে সে! সাত আসমানে, নাকি অন্ধকার রাতে কোন প্লেনের কেবিনে?

'তুমি বরং নেমে এসো, রাসেল,' আদেশ করলেন কমান্ডার হ্যারি গোল্ডম্যান।

'কিন্তু যদি কুয়াশা পাতলা হতে শুরু করে...'

'বেশ। পনেরো মিনিট। তারপর নেমে এসো।'

ক্লিয়ার-ভিশন প্যানেলে গাল চেপে ধরে তাকাল রাসেল। মনে হলো বরফে ছ্যাঁকা খেলো গালের চামড়া। কাঁচের গা ভিজে গেছে, তার ওপর কুয়াশায় ঝাপসা, কিছুই দেখতে পেল না। জাহাজ প্রায়

অচলই বলা চলে, রাডার উইং-এর সাহায্যে ধীর, অতি ধীর গতিতে এগোচ্ছে—টের পাওয়া যায় কি যায় না। সামনে যদি কোন আইসবার্গ থাকে, রাডারের ধাতব চোখ প্রতিধ্বনি পাঠিয়ে সতর্ক করে দেবে।

কিন্তু রাডার মেকানিজম এই আবহাওয়ায় নির্ভুলতার কোন রকম গ্যারান্টি দেয় না, ডেপুটি মেট বেন ক্যাফম্যানের সে-কথা ভাল করেই জানা আছে। অভিজ্ঞ রাডার অপারেটর সে, ব্যাকুলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্কোপে। পিং পিং পিং আওয়াজ শোনার জন্যে কান দুটো সজাগ। ওই আওয়াজ শুনেই শুধু বোঝা যাবে বড়সড় কিছু একটা রয়েছে বো-র সামনে।

একঘেয়ে শব্দে নামেমাত্র চালু রয়েছে ইঞ্জিন। জাহাজের সবচেয়ে লম্বা আর নিঃসঙ্গ মানুষ, কেন্ রাসেল, ঢেউ খেলানো কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকল সম্মোহিতের মত।

'রাসেল?' ব্রিজ থেকে প্রশ্ন করলেন কমান্ডার।

'কিছুই রিপোর্ট করার নেই, স্যার।' চারদিকের দেয়ালে গাল চেপে ধরে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল রাসেল। মনে হলো সামনের কুয়াশা একটু যেন পাতলা হতে শুরু করেছে। এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তবে গাঢ় কুয়াশার ভেতর নতুন ধরনের একটা আলোড়ন পরিবর্তনের আভাস দেয়। ক্ষীণ একটু বাতাস বইছে না তো? লাফানো বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল সে। আবার প্যানেলে মুখ-গাল চেপে ধরল। হ্যাঁ, আর কোন সন্দেহ নেই; কিছু একটা তাড়া করছে কুয়াশাকে।

পিং পিং সতর্ক-সঙ্কেত অনেক দেরিতে এল, এল হঠাৎ করে। স্কোপের কাঁটা এক নিমেষে পুরো এক চক্কর ঘুরে গেল, আচমকা

ফুটে উঠল নতুন একটা আকৃতি। ঝট করে মাথা তুলল বেন ক্যাফম্যান। চিৎকার দিল।

কেন্ রাসেল বোধহয় আসতেই দেখেনি ওটাকে। যদি দেখেও থাকে, তারপর আর আধ সেকেন্ডও সময় পায়নি। বরফের থাবা, পাঁচিলের মাথা থেকে লম্বা হয়ে কিউটের পথ পর্যন্ত বেরিয়ে আসা বাহু ডেক থেকে আশি ফুট উঁচু ছিল। ধীরগতিতে হলেও, সরাসরি সেই থাবার মধ্যে গিয়ে পড়ল আইসব্রেকার। মাস্তুলটা ঘ্যাঁচ করে কেটে গেল, অবজারভেশন পোস্ট আর রাডার উইং সহ মাস্তুলের মাথা নিচের অংশ থেকে চোখের পলকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ব্রিজে দাঁড়িয়ে সংঘর্ষের আওয়াজ পেল ওরা, আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ক্যাফম্যানের গলা চিরে। খাঁচার ভেতর বন্দী কেন্ রাসেল প্রায় একশো ফিট ওপর থেকে স্টারবোর্ড সাইডে পড়ল। ডেক রেইলের গায়ে ধাক্কা খেলো খাঁচা, ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল, একটা টুকরো রাসেলকে নিয়ে ঝপ্ করে পড়ল হিম পানিতে। রাডার সহ মাস্তুলের মাথার ওজন হবে পাঁচ টন, পানিতে পড়ার সাথে সাথে তলিয়ে গেল। সাগরের গভীরতা এখানে নয় থেকে দশ হাজার ফিট।

নিহতদের তালিকায় যোগ হলো আরও একজনের নাম। তাকে নিয়ে এরইমধ্যে মারা গেছে বিশজন। বাকিরা–সিকিউরিটি গার্ড পিটার আন্তভ, মাইকেল জনসন, ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের ষোলোজন আরোহী, এবং ড. কর্ডন।

কিউট এখন অন্ধ। রাডার নেই। তাকে গ্রাস করেছে কুয়াশা, ঘিরে আছে বরফ। আইসফিল্ডের কিনারায় আটকা পড়েছে আইসব্রেকার, যে আইসফিল্ডকে ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

যে-কোন বিচারে, চরম ঝুঁকি নিয়ে এত দূর চলে এসেছে কিউট, যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেছে। আর কত? যে যাই বলুক, এরপর আর সামনে এগোনো সম্ভব নয়। কমান্ডার হ্যারি গোল্ডের সামনে একটাই পথ এখন খোলা–বো ঘুরিয়ে নিয়ে বন্দরে ফিরে যাবার চেষ্টা করা।

কার্টিস ফিল্ডে উৎসবমুখর হয়ে উঠল পরিবেশ। কোড-সিগন্যাল–'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট...পেলিকান' রিসিভ করেছেন জেনারেল ফচ, আনন্দে বগল বাজাচ্ছেন তিনি। 'ইভেনকো রুস্তভ আমাদের হাতে! রানা তাকে নিয়ে দক্ষিণে আসছে কিউটে ওঠার জন্যে।'

কার্টিস ফিল্ডে ছোট্ট অফিসটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে জেনারেলকে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন তিনি। জানালার নিচে তিনটে হিটার জ্বলছে, ভেতরটা গরম। সিগন্যাল এই একটাই পাননি তিনি।

তাঁর সহকারী টমাস উড দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বসের দিকে তাকিয়ে আছে।

পায়চারি করতে করতে জেনারেল আবার বললেন, 'আই.আই.ফাইভের পশ্চিমে গিজগিজ করছে রাশিয়ান সিকিউরিটি।' নিভে যাওয়া চুরুটে ঘন ঘন টান দিলেন, জ্বলজ্বল করছে মুখের চেহারা। 'বরফের ওপর হেলিকপ্টার রয়েছে ওদের, প্যাকে রয়েছে স্লেজ-টীম। স্নো-ক্যাটও আছে।'

'পরিস্থিতি ঘোলাটে,' মন্তব্য করল টমাস।

'ওয়াশিংটনে বসে বলেছিলে, অপারেশনটা পানির মত সহজ,

মনে আছে?’ খেঁকিয়ে উঠলেন ফচ। ঘরে ঢুকল এয়ারফিল্ড কন্ট্রোলার হাওয়ার্ড ম্যাকলিন। ‘ঠিক সময়েই এসেছ। উপকূল আর আই. আই. ফাইভের মাঝখানে গোটা এলাকায় ইনটেনসিভ এয়ার সার্ভেইল্যান্স চাই আমি। যে মেশিনগুলো তুমি পাঠিয়েছ, তিন ভাগের এক ভাগ নজর রাখবে আই.আই. ফাইভের উত্তরে...,’ সাথে করে নিয়ে আসা ম্যাপটা দেয়ালে আগেই ঝোলানো হয়েছে, সেটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

‘এখানে...আর এখানে।’

‘দক্ষিণে?’ জিজ্ঞেস করল হাওয়ার্ড ম্যাকলিন।

‘না! নন্‌-স্টপ সার্ভেইল্যান্স চাই আমি। পাইলটরা যাবে, ফিরবে, ফুয়েল নেবে, আবার যাবে...কোন বিরতি ছাড়া চলতেই থাকবে এভাবে।’

‘কিন্তু পাইলটদেরও একটা সহ্যক্ষমতা আছে...,’ প্রতিবাদের সুরে শুরু করল হাওয়ার্ড।

‘সেটা কতটুকু, জানার এমন সুযোগ আর পাবে না,’ উত্তরে বললেন জেনারেল ফচ। ‘জানার পর সেটা আরও বাড়িয়ে নিতে বলবে।’

‘বুঝলাম না,’ হাওয়ার্ড বেরিয়ে যেতেই জিজ্ঞেস করল টমাস, ‘রানা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, তাহলে উত্তর আর পশ্চিমে প্লেন পাঠাবার মানে কি?’

‘তুমি যখন বোঝোনি, বলটুয়েভও বুঝবে না। পোলার প্যাকে রানাকে খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, ভাগ্য যদি না সহায় হয়। কাজেই সে-চেষ্টা বাদ দিচ্ছি আমরা। তার বদলে রাশিয়ানদের ভুল বোঝাবার কাজটা জরুরী।’ জানালার

বাইরে দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেল, রোটর আর এঞ্জিনের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন জেনারেল। 'বরফের ওপর বলটুয়েভের হেলিকপ্টার আছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে আমাদের প্লেনের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে ওদের পাইলটরা।'

'বেশ। তারপর?'

'কি ভাববে বলটু? ভাববে, আমেরিকানরা ইভেনকো রুস্তভকে খুঁজছে। ভাববে, কোথায় তাকে খুঁজতে হবে আমেরিকানরা তা জানে।'

'ফলে দক্ষিণ থেকে সে তার হেলিকপ্টার ফিরিয়ে আনবে?'

'ঠিক তাই। রেঞ্জের বাইরে বেরিয়ে আসার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে রানা।'

মাথা ঝাঁকাল টমাস। 'প্ল্যানটা ভাল, তবে...'

'ভাল নয়, চমৎকার!' ধমকে উঠলেন জেনারেল। 'বলটুকে আসলে একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছি আমরা—রানা উত্তর বা পশ্চিম দিকে যাচ্ছে!'

তিন

'উত্তর না পশ্চিম?'

রুশ আর্কটিক ঘাঁটি, এন.পি.সেভেনটিন। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আপনমনে বিড়বিড় করল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। টেবিলে পকেট সংস্করণ দাবার ছক মেলা রয়েছে, পাশে একটা

খোলা বই। উনিশশো ছেষট্টি সালে সান্তা মোনিকায় ফিশার-স্প্যাসস্কি দাবা খেলার রেকর্ড রয়েছে বইটায়। উর্বর মস্তিষ্ক, তিনটে কাজ একসাথে সারতে পারে বলে প্রায়ই গর্ব করে কর্নেল। এই যেমন এখন—নিজের খেলা খেলছে, আরেকজনের খেলা পরীক্ষা করছে, সেই সাথে চলতি অপারেশন সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করছে।

'সব ক'টা হেলিকপ্টার আকাশে,' চেয়ারের পিছন থেকে রিপোর্ট করল জুনায়েভ। 'আই.আই.ফাইভের উত্তর আর পশ্চিম দিকে নজর রাখছে ওগুলো—সব ক'টা, শুধু ছয়টা বাদে। এই ছয়টাকে আপনি রাখতে বলেছেন।'

মার্কিন স্নো-ক্যাট র‍্যাম্পে ধ্বংস হবার পর আই.আই.ফাইভ থেকে দ্বিতীয়বার ঘুরে এসেছে ওরা। দেখে এসেছে বরফ-দ্বীপ পরিত্যক্ত, কেউ নেই সেখানে। বলটুয়েভের জানার কথা নয়, গুন্টার রডেনবার্গ আর জেমস কাজম্যান রয়ে গেছে ওখানে। ইভেনকো রুস্তভ যদি আসে, ভেবে ছোট একটা ডিটাচমেন্ট ওখানে রেখে এসেছে কর্নেল। এন.পি.সেভেনটিনে ফিরে আসার পরপরই লেনিনগ্রাদ রেকর্ডস থেকে একটা মেসেজ পায় সে। মেসেজটা তাকে হতভম্ব করে তোলে।

'আমরা যে বারবার রানার দল রানার দল করছি, জানো ওরা ক'জন?' যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল কর্নেল। 'লেনিনগ্রাদ থেকে খবর এসেছে, নিয়াজ আর বিনয়, মাত্র এই দু'জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে আর্কটিকে এসেছে মাসুদ রানা।'

'মাত্র তিনজন? ইভেনকো রুস্তভকে নিতে এসেছে?' জুনায়েভের চেহারায় রাজ্যের অবিশ্বাস।

‘হ্যাঁ, তিনজন খুব কম লোক,’ বলল কর্নেল। ‘কিন্তু কোন কোন লোক একাই অনেক, এ-কথা জানো তো? ওদের দু’জনকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো জন ধরো, আর রানা একাই একশো—কত হলো? সংখ্যায় তিনজন, কিন্তু শক্তিতে দুশো। এবার সুবিধেগুলো হিসেব করো। সংখ্যায় কম, কাজেই কারও চোখে ধরা পড়ার ভয় কম। ইভেনকো সাথে থাকলে চারজন, চারজন লোককে পোলার প্যাকে খুঁজে পাওয়া সহজ, না কঠিন, জুনায়েভ? কতটুকু কঠিন?’

‘প্রায় অসম্ভব, কর্নেল কমরেড।’

‘বারবার প্রমাণও হচ্ছে তাই,’ বলল কর্নেল। ‘দু’দিন আগে যে ছবিটা তোলা হয়েছে, মনে আছে? একদল লোক কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে পড়ছিল?’ হঠাৎ করেই মেঝেতে পা ঠুকল সে। ‘সব ক’টা কপ্টারকে কোডেড সিগন্যাল পাঠাও—ওরা আসলে ছোট একটা দলকে খুঁজছে। সম্ভবত একজোড়া স্লেজ-টীম আর চারজন লোক।’

‘যে ছয়টাকে আপনি রাখতে বলেছিলেন…’

‘ওগুলো দক্ষিণে যাবে—আই.আই.ফাইভের দক্ষিণে।’

‘কিন্তু কর্নেল কমরেড, আমেরিকানরা উত্তর আর পশ্চিম দিকে নজর…!’

কর্নেল হুঙ্কার ছাড়ল, ‘এখনও তুমি যাওনি?’

একা হতেই পায়চারি শুরু করল সে। কিছু উদ্ভট সিদ্ধান্ত কখনোই সে ব্যাখ্যা করে না। জেনারেল দ্য গলের মত নিজের চারপাশে রহস্যের একটা অদৃশ্য বলয় তৈরি করে রাখতে পছন্দ করে। পরে যদি সিদ্ধান্তগুলো ভুল প্রমাণিত হয়, গা বাঁচানোর পথ খোলা থাকে। কি সে করতে চাইছিল তাই যদি কেউ না জানে, কোথায় ভুল করেছে ধরবে কিভাবে?

তবে কর্নেলের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, ধীরে ধীরে বাড়ছে সেটা। মারমানস্ক থেকে বাইসন বম্বারে চড়ে আসার সময় জেনারেল ফচের ডোশিয়ে পড়েছে সে। জেনারেল ফচ ডিসেপশন অপারেশনে স্পেশালিস্ট। এ-ব্যাপারে মাসুদ রানা আরও এক কাঠি বাড়া। আমেরিকানরা আই.আই. ফাইভের উত্তর আর পশ্চিমে প্লেন পাঠিয়েছে, এই বাস্তব ঘটনা অগ্রাহ্য করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায়, ওদিকের এলাকাগুলো চেক করা না হলে জবাবদিহি করতে হবে তাকে। কিন্তু আসলে দক্ষিণ দিকটাই তার মনোযোগ কাড়তে শুরু করেছে।

খানিক পর ফিরে এল জুনায়েভ। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেকঅফ করছে ওগুলো।'

'চমৎকার! এবার হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভায় সিগন্যাল পাঠাও, আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটের পজিশন জানতে বলো ওদের।'

আবার বিস্ময় বোধ করল জুনায়েভ, কিন্তু প্রশ্ন করার সাহস হলো না। ব্যস্ত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কেন যেন মনে হলো কর্নেলের, রানার সাথে অচিরেই আবার দেখা হতে যাচ্ছে তার। ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। পায়চারি থামিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ঘোড়ার চাল দিল আড়াই ঘর।

রানা কোন যুক্তি মানছে না। বলা ভাল, যেন পণ করেছে কারও কথাই শুনবে না ও। সহকর্মী আর কুকুরগুলোকে অমানুষিক খাটাচ্ছে, গোঁয়ারের মত জেদ ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের

দিকে। কড়া নির্দেশ, কোন কারণেই থামা চলবে না। না বিশ্রামের জন্যে, না কিছু মুখে দেয়ার জন্যে। জোড়া স্লেজ-টীম টেন্থ মেরিডিয়ান ধরে বিরতিহীন ছুটে চলেছে দক্ষিণ দিকে, ক্রমশ কাছে চলে আসছে আইসফিল্ডের কিনারা, আইসবার্গ অ্যালি।

চারদিক থেকে ওদেরকে ঘেরাও করে রেখেছে প্রেশার রিজ, এবড়োখেবড়ো বরফের বিশাল প্রাচীর একেকটা। নালা-পথ ধরে ছুটছে কুকুরগুলো, চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে সাদা প্রকৃতি। নিজের স্লেজ-টীম নিয়ে সামনে রয়েছে রানা, নির্দয়ভাবে মুহুর্মুহু চাবুক মারছে কুকুরগুলোর পিঠে। প্রাণপণে ছুটছে ওগুলো, শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে। বেশ খানিকটা পিছনে রয়েছে বিনয়ের টীম, তার পাশে থাকার জন্যে ঝড়ের বেগে ছুটতে হচ্ছে নিয়াজকে।

‘এর কোন মানে হয়?’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিয়াজ। ‘ওর সাথে আমাদের কথা বলা দরকার।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বিনয়।

ছোটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে রানার পাশে চলে এল নিয়াজ। ‘রানা, কুকুরগুলোর বিশ্রাম দরকার। এভাবে বেশিক্ষণ ছুটতে পারবে না...’

ফার হুডের ফাঁকে যতটুকু দেখা যায়, কঠোর রানার চেহারা। বার কয়েক সপাং সপাং করে উঠল হাতের চাবুক। কুকুরগুলো আরও একটু বাড়িয়ে দিল ছোটার গতি। সামনে মোড় নিয়েছে নালা, গতি যাতে মন্থর না হয় সেজন্যে বারবার চাবুক মারল রানা। মাত্র একদিকের রানার-এ ভর করে বাঁক নিল স্লেজ, বরফের ছাল তুলে একই গতিতে ছুটল। নিয়াজের কথা যেন

শুনতেই পায়নি ও।

‘আরেকবার ভাবো,’ অনুরোধের সুরে বলল আবার নিয়াজ। ‘আমাদেরও বিশ্রাম দরকার। কিউট এখনও অনেক দূরে। আজ রাতে ওখানে আমরা পৌঁছুতে পারব না...!’

পাল্টা চিৎকার করল রানা, ‘বাঁচতে হলে ছুটতে হবে। তোমরা চাও বিশ্রামের জন্যে থেমে চির বিশ্রামের ঝুঁকি নিই?’

‘রুস্তভ সাহেবের কথা ভেবে দেখেছ?’ জিজ্ঞেস করল নিয়াজ। ‘উনি আর পারছেন না।’

তাড়াতাড়ি পিছন দিকে তাকাল রানা। বিনয় আর তার স্লেজ-টীমের পিছনে রয়েছে ইভেনকো রুস্তভ। পিছিয়ে পড়েছে বেশ খানিকটা, তবে ছুটছে এখনও। নজর বুলিয়েই বুঝল রানা, ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে। একটু হয়তো নিষ্ঠুর, কিন্তু কৌশলটা কাজ দিচ্ছে, ভাবল ও। ওরই নির্দেশে সবার পিছনে থাকতে হয়েছে রুশ বিজ্ঞানীকে। যে-কোন একটা স্লেজে জায়গা দেয়া যেত তাঁকে, কিন্তু হিতে বিপরীত হত তাতে, গোটা দলটাকে পিছিয়ে দিত লোকটা। এরইমধ্যে রানার জানা হয়ে গেছে, ভদ্রলোকের স্বভাবই হলো প্রত্যেকটি বিষয়ে খুঁত বের করে জেদ ধরা। স্লেজে ঠাঁই না পাওয়ায় সারাক্ষণ তার মনে একটা ভয় কাজ করছে, তাকে একা ফেলেই না চলে যায় ওরা। তিন ঘণ্টা আগে রানা বলেছিল, ‘ওঁকে একটা আতঙ্কের মধ্যে রাখতে হবে, তা না হলে প্রতি পদে বাধা দেবেন উনি।’

‘ওঁর বয়স হয়েছে...,’ আবার শুরু করল নিয়াজ।

‘ব্যাপারটা যে পিকনিক পার্টি হবে না, জেনেই নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়েছেন উনি,’ বলল রানা। ‘দু’চারবার আছাড় না খাওয়া

পর্যন্ত ওঁর সাথে কেউ কথা বোলো না। আমার সাথেও নয়,...স্লেজ চালাচ্ছি।’

পিছিয়ে পড়ল নিয়াজ। রানার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে, কারও কথা শুনবে না। ওর সাথে সামনে ছোটা ছাড়া উপায় নেই।

আসলে রানার মেজাজ মোটেও বিগড়ায়নি। নিয়াজকে চুপ করাবার সবচেয়ে সহজ পথটা বেছে নিয়েছে ও। বিশ্রামহীন এই ছুটে চলা, এ-ও যুক্তিহীন কোন জেদ নয়। ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে দেখেছে রানা, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিন ঘণ্টা হয়ে গেল কোন রাশিয়ান হেলিকপ্টার দেখেনি ওরা। কারণটা ওর জানা নেই। তবে চাঁদের আলোয় আকাশ পরিষ্কার থাকায় সুযোগটা হাতছাড়া করা চলে না। যতটা সম্ভব দক্ষিণে সরে যেতে হবে ওদের। তবেই যদি বলটুয়েভের হেলিকপ্টারগুলোকে ফাঁকি দেয়া যায়।

কিউটের সাথে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না রানা, ভেবে রেখেছে। কাউকে বলেনি, কারণ তর্ক বেধে যাবে। ওর নিজের মনেও সন্দেহ আছে, আজ রাতে কিউটের দেখা না-ও পাওয়া যেতে পারে। তবে আশা ছাড়েনি এখনও। সবাইকে নিয়ে এভাবেই সামনের দিকে ছুটবে ও, যতক্ষণ না কিউটের সাথে যোগাযোগ হয়। কিংবা যতক্ষণ না কুকুরগুলো বরফের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এক ঘণ্টা পর দক্ষিণ-পুবে উঁকি দিল আমেরিকান প্লেন।

‘হল্ট!’

পিছনের ওদেরকে সাবধান করার জন্যে ঝট্ করে হাত তুলল

রানা, সীসার মত ভারী লাগল হাতটাকে। কুকুরগুলোকে দাঁড় করিয়ে নিয়াজের হাতে চাবুকটা ধরিয়ে দিল, তারপর বাঁ দিকের প্রেশার রিজে ওঠার জন্যে খামচাখামচি শুরু করল। যেখানেই পা রাখে, ভেঙে যায় বরফ। দস্তানা পরা হাত পিছলে নেমে আসে। এতই ক্লান্ত, মনে হলো কয়েক সেকেন্ড নয়, কয়েক বছর ধরে পাহাড়ে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ও। দূর থেকে ভেসে আসা এঞ্জিনের আওয়াজ জোর তাগাদা দিচ্ছে–তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! আওয়াজটা অন্য রকম, সোভিয়েত হেলিকপ্টারের ভোঁতা ভট ভট নয়। একরোখা চেষ্টায় অবশেষে পাঁচিলের মাথা নাগালের মধ্যে চলে এল। তারপর খুব সহজেই উঠতে পারল রানা। নাইট-গ্লাস চোয়াল আর বুকের মাঝখানে আটকে গিয়েছিল, ব্যথাটা টের পেলেও গ্রাহ্য করল না। গ্লাস জোড়া চোখে তুলে দূরে তাকাল।

স্থির হয়ে থাকা ঢেউ আকৃতির প্রেশার রিজের প্রায় শেষ সীমানায় চলে এসেছে ওরা, খানিক সামনে থেকে শুরু হয়েছে জমাট সাগরের সমতল বিস্তার। দু'হাজার ফিট ওপরে রয়েছে প্লেনটা, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উড়ে যাচ্ছে, একটু পর ওদের আধ মাইল দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে। ফোকাসিং মেকানিজম হাতড়াতে শুরু করল রানা–আমেরিকান, না রাশিয়ান? কাঠামোটা ঝাপসা দেখাল, ভাবল ফোকাস অ্যাডজাস্ট হয়নি। তারপর বুঝল, তা না, আসলে ক্লান্ত চোখ অসহযোগিতা করছে। হাত দিয়ে রগড়ে আবার গ্লাসে চোখ রাখল, লেন্সে পরিষ্কার ধরা পড়ল প্লেন, ফিউজিলাজে সাদা তারকা-চিহ্ন আঁকা। মার্কিন!

'নিয়াজ! স্মোক ফ্লেয়ার! জলদি! আমেরিকান...'

নালায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, আনন্দ আর বিস্ময়ের ধাক্কায় এক

সেকেন্ড কেউ নড়তে পারল না। ইতিমধ্যে প্রথম ডগ-টীমের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ইভেনকো রুস্তভ, তার হাতে হ্যান্ডেলবার আর চাবুক ধরিয়ে দিয়ে স্মোক ফ্লেয়ার খুঁজতে শুরু করল নিয়াজ।

'জলদি!' তাগাদা দিল রানা।

ফ্লেয়ার নিয়ে পাঁচিলে উঠতে চেষ্টা করল নিয়াজ। অর্ধেকটা উঠল, রানার বাড়ানো হাতে সেটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে পা পিছলে নেমে এল নালায়। দাঁতে দাঁত চাপল রানা। ভাগ্য আর প্রকৃতি নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছে ওদের নিয়ে।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় পাঁচিলের মাথায় উঠতে পারল নিয়াজ, আগেই তার কাছ থেকে স্মোক ফ্লেয়ার নিয়ে নিয়েছে রানা। কিন্তু হাত দুটো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আছে, বারবার পড়ে গেল ফ্লেয়ারটা। বার কয়েক চেষ্টা করার পরও জ্বলল না। চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'এটা নষ্ট, আরেকটা দাও!'

ছুটে রানার স্লেজের কাছে চলে এল বিনয়, নিয়াজও খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এল নালায়। ওরা যখন ফ্লেয়ার খুঁজছে, প্লেনের ডানায় লাল আর সবুজ আলো ঘুরতে শুরু করেছে। নতুন কোর্স ধরে দক্ষিণ দিকে, আরও দূরে চলে যাচ্ছে প্লেন। 'জলদি করো, ফর গডস সেক!' গর্জে উঠল রানা। বিনয়ের হাতে একটা ফ্লেয়ার দেখল ও। 'ওখান থেকেই, ওখান থেকেই–তাড়াতাড়ি!'

জ্বলে উঠল ফ্লেয়ার, গাঢ় ধোঁয়া ছাড়ল, শান্ত বাতাস ভেদ করে হুস করে উঠে গেল আকাশে। লাল আর নীল আলোকমালা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। প্রতিমুহূর্তে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সাথে আরও দূরে সরে যাচ্ছে প্লেনটাও। প্রতি মুহূর্তে ছোট হয়ে আসছে সেটা। চাঁদের আলোয় এক সময় খুদে একটা বিন্দুর মত

দেখাল ওটাকে। বরফের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাঁচিলের মাথায়, রানার পাশে উঠে এল বিনয় আর নিয়াজ।

'এখনও চলে যায়নি...' যেন নিজেকে আশ্বাস দিল নিয়াজ। 'পিছন দিকে তাকাও, ভাই,' পাইলটের উদ্দেশে বিড়বিড় করছে সে। 'চোদ্দপুরুষের দোহাই লাগে, একবার পেছন ফেরো!' ওদের দৃষ্টিসীমা থেকে হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল রূপালি বিন্দুটা। শুধু এঞ্জিনের অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল আরও কিছুক্ষণ, তারপর সেটাও মিলিয়ে গেল দূরে।

'রুটিন ওয়েদার ফ্লাইট,' বলল রানা। 'আমাদের খোঁজে আসেনি।'

'অবজারভার লোকটাকে ধরতে পারলে চড় লাগাব,' রাগে ফুঁসে উঠল বিনয়। 'আমাদের বোধহয় রেডিও ব্যবহার করা উচিত ছিল।'

'পাগল নাকি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'রেঞ্জের মধ্যে কিউট না এলে রেডিও ব্যবহার করার প্রশ্নই ওঠে না। সামনে সেট নিয়ে অপেক্ষা করছে সোভিয়েত অপারেটর, রেডিও অন করলেই লোকেশন জেনে ফেলবে। গেট রেডি!'

নিঃশব্দে রওনা হলো ওরা, মাথার ওপর এখনও জ্বলজ্বল করছে লাল নীল আলোকমালা। সবাই কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে, এমনকি কুকুরগুলোকেও বিষণ্ন মনে হচ্ছে। দুর্গম পথ পিছনে ফেলে সমতল জমাট সাগরে নেমে এল স্লেজ, এখন থেকে খুব দ্রুত আর সহজে এগোনো যাবে, তবু মন খারাপ সবার।

আসলে হতাশা আর ক্লান্তিতে রানার বুদ্ধিশুদ্ধি খানিকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। হাড়ের প্রতিটি জয়েন্টে টনটনে ব্যথা, অসাড় পেশী,

চোখ জোড়া এমন জ্বালা করছে যেন লংকাগুঁড়ো ঘষে দিয়েছে কেউ। হ্যান্ডেলবার ধরে আছে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে মুঠো থেকে ছুটে যেতে পারে। ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে প্রতি মুহূর্তে। ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। শুধু বেঁচে থাকার প্রবল আগ্রহে ছুটে চলেছে ও সামনে। শরীরের শেষ শক্তিটুকু থাকতে থামা চলবে না ওদের। শুধু নিজের কথা নয়, সবার কথাই ভাবতে হবে ওকে।

'লুক আউট!' গলা ফাটাল নিয়াজ।

'কেউ নড়বে না!' বিস্ফোরিত হলো রানা।

অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল স্লেজ দুটো। ওদের পিছনে আর্কটিক রাতের নিস্তব্ধতা এঞ্জিনের ভোঁতা ভট ভট আওয়াজে ভেঙে খান খান হলো। তারপর ছায়াটা দেখা গেল। স্থূল আকৃতির কালো ছায়া। জোড়া রোটর, একটার ওপর আরেকটা। লেজের দিকে একজোড়া ফিন। ওদের মাথা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফিট ওপর দিয়ে উড়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িং। টুইন জেট সাবমেরিন কিলার। রাশিয়ানদের লেটেস্ট হেলিকপ্টার।

'খোদার দোহাই, নোড়ো না কেউ!' আবার সাবধান করল রানা। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে হেলিকপ্টার, সেই সাথে বাঁক নিতে শুরু করে আরও ওপরে উঠছে। রুশ আরোহীরা ওদেরকে নাও দেখে থাকতে পারে। আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল গতিতে উড়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে, আচমকা প্রেশার রিজের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এসেছিল খোলা প্রান্তরে—ওদেরকে দেখতে পাবার জন্যে রুশ অবজারভারের তীক্ষ্ণ চোখ থাকতে হবে। কয়েক সেকেন্ড পর জানা গেল, তাই আছে। ফিরে আসছে হেলিকপ্টার।

সর্বনাশ ঘটিয়েছে স্মোক ফ্লেয়ার। আমেরিকান পাইলটের

চোখে ধরা না পড়লেও, কাছাকাছি কোথাও থেকে রুশ হেলিকপ্টারকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে।

ফিরে আসছে। আগের চেয়ে ধীর গতিতে আসছে, অনেক উঁচু দিয়ে। তারমানে শুধু যে স্লেজগুলো দেখেছে তাই নয়, কাঁধে ঝোলানো রাইফেলগুলোও দৃষ্টি এড়ায়নি। তা না হলে পঞ্চাশ ফিট থেকে দুশো ফিটে উঠে যেত না।

'কি করবে ওটা?' জিজ্ঞেস করল বিনয়।

'কতজন লোক আছে তার ওপর নির্ভর করে,' বিড়বিড় করল রানা।

দলের দায়িত্ব নিয়াজকে দিয়ে খানিক দূরে সরে দাঁড়াল ও, একা। রাইফেলটা হাতেই থাকল। আজরাইলের মত এগিয়ে এল স্থূলকায় সাবমেরিন কিলার। মাথার ওপর চলে আসার পর মনে হলো, রোটরের আওয়াজে পায়ের নিচে বরফ কাঁপছে। রাইফেল তুলল রানা, মাজ্‌ল্‌ অনুসরণ করল কিলারকে।

শূন্যে স্থির হতে যাচ্ছিল কিলার, রানার ভাবগতিক সুবিধের নয় বুঝতে পেরে একদিকে কাত হয়ে তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেল, পিছনে রেখে গেল সাদাটে ধোঁয়া।

কিন্তু না, এত সহজে বিদায় নিতে ফিরে আসেনি পাইলট। নিরাপদ দূরত্বে থেকে ঘুরতে লাগল কিলার। ওটার ওপর চোখ রাখার জন্যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরতে হলো ওদেরকেও। হঠাৎ আঁতকে উঠল নিয়াজ। 'সাবধান! ওরা টেলিস্কোপ সাইটে চোখ রেখে দেখছে আমাদের...!'

কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে চোখে নাইট-গ্লাস তুলল রানা। 'রাইফেল নামাও!' নিয়াজকে নির্দেশ দিল ও। নিজের জায়গায়

দাঁড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখল, হেলিকপ্টারের দরজার গায়ে বসানো জানালা খুলে গেছে, চাঁদের আলোয় ভেতরে দেখা যাচ্ছে কালো চকচকে একটা মাজ্ল্। 'সিনে-ক্যামেরা,' আবার বলল রানা। 'আমাদের ছবি তুলছে—ভয় পাবার কিছু নেই। ক্যামেরায় ওটা টেলি-ফটো লেন্স ব্যবহার করছে ওরা।'

'নিয়মও তো তাই,' মন্তব্য করল নিয়াজ, 'ছবি শুধু হিরো আর ভিলেনদের তোলা হয়!'

রুশ সাবমেরিন কিলার কোর্স বদলে যাচ্ছে, উত্তর-পুব দিকে। এঞ্জিনের আওয়াজ দ্রুত মিলিয়ে গেল। স্লেজের কাছে ফিরে এসে নিয়াজের কাছ থেকে হ্যান্ডেলবার নিল রানা।

'আমি জানি কেন ল্যান্ড করেনি,' বলল নিয়াজ।

'লোকজন কম বলে।' দূরে তাকাল রানা, সমতল বরফের পর, বহু দূরে, আবার শুরু হয়েছে প্রেশার রিজ। 'ফিরে এসে আবার যদি খোলা জায়গায় পায় আমাদের, একজনও বাঁচব না।'

ফিরে যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার শুধু লোকবল নয়, সাথে অস্ত্রবলও থাকবে।

চার

বদ্ধ ঘরের ভেতর ধোঁয়া আর তামাকের গন্ধ। প্রজেক্টরের মৃদু গুঞ্জন। অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ, 'ফ্রেমটা ধরে রাখো!'

প্রজেক্টর থামাল অপারেটর, পর্দায় স্থির হয়ে গেল ছবি।

চারজন লোক, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। একজন লোকের হাতে রাইফেল, অপরজনের চোখে নাইট-গ্লাস। পর্দার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একটা ছায়ামূর্তি–বলটুয়েভ। ছায়ামূর্তির একটা হাত লম্বা হলো, আঙুল দিয়ে পর্দার একজন লোককে দেখাল। লোকটা একটা স্লেজের হ্যান্ডেলবার ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'সেই শালা, আমার পেনশন বাজি রেখে বলতে পারি,' নিস্তব্ধ কামরায় গমগম করে উঠল তার ভারী গলা। 'ইভেনকো রুস্তভ! বেঈমান!'

অন্ধকার থেকে মৃদু প্রতিবাদ জানাল নিকিতা জুনায়েভ, 'কিন্তু কর্নেল কমরেড, ওদের কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না...'

'মুখে পেচ্ছাব করি!' মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। 'কুত্তাটার প্রতিটি নড়াচড়া আমার মুখস্থ। দেখছ না একপাশে কেমন কাত করে রেখেছে মাথাটা, বানচোতের এই ভঙ্গিটা আমার চেনা আছে।' চোখে নাইট-গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার ওপর মোটা একটা আঙুল রাখল সে। 'আর এ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত শত্রু। মাতৃভূমির মুখে কলঙ্ক মাখিয়েছে। মিগ একত্রিশ চুরি করে নিয়ে গিয়ে অপমান করেছে গোটা রাশিয়াকে। মাসুদ রানা। বাকি দু'জন ওর চেলা, আমেরিকানদের আর্কটিক রিসার্চ বেসে গবেষণা করে–বিনয় মুখার্জি আর নিয়াজ মাহমুদ।'

'আমরা তাহলে উত্তর আর পশ্চিম থেকে প্লেনগুলোকে ফিরিয়ে আনব, কর্নেল কমরেড?' জিজ্ঞেস করল জুনায়েভ।

'ব্যাটাচ্ছেলে, আগে তুমি ঘরের আলো জ্বালো,' নির্দেশ দিল কর্নেল। আলো জ্বলে উঠতেই চোখে হাতচাপা দিল সে, তারপর পিছনে বসা একজন লোকের দিকে তাকাল। 'খুস্কায়েভ, আবার

তুমি ওদের খুঁজে বের করতে পারবে?'

খুস্কায়েভ, আটাশ, মারমানস্ক থেকে নিয়ে আসা ডিটাচমেন্টের নেতৃত্ব দিচ্ছে। চেহারায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ভাব নিয়ে ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে। কয়েক পা এগিয়ে ওয়াল-ম্যাপের সামনে চলে এল, আঁক কাটা একটা জায়গায় আঙুল রেখে বলল, 'এখানে, কর্নেল। স্টার-ফিক্স নির্ভুল হলে...'

'তারমানে পারবে?' অধৈর্য হয়ে আবার জানতে চাইল কর্নেল।

'একবার যখন পেরেছি...,' কর্নেলের চেহারা দেখে চুপ করে গেল খুস্কায়েভ।

'সে কৃতিত্ব তোমার নয়,' কঠিন সুরে বলল কর্নেল। 'পাঁচ মাইল দূরে থেকে স্মোক ফ্লেয়ার দেখে ওদিকে গিয়েছিলে।' আপন মনে মাথা নাড়ল সে। 'কে জানে কেন স্মোক ফ্লেয়ার ছাড়ল ওরা—হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট।'

'হ্যাঁ, কর্নেল কমরেড,' আমতা আমতা করে বলল খুস্কায়েভ, 'বলা যায় ভাগ্যই আমাদেরকে সাহায্য করেছিল...'

'ভাগ্যের সাহায্য আবার কিভাবে পেতে পারো, আমার কাছ থেকে জেনে নাও!' খুস্কায়েভের হাত থেকে পেন্সিলটা কেড়ে নিয়ে ম্যাপের দিকে তাকাল কর্নেল। 'ওরা আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটে চড়বে বলে দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। কিউট রয়েছে এখানে,' ম্যাপের গায়ে একটা আঁক কাটল সে। 'আই.আই. ফাইভ আর কিউটের মাঝখানে একটা সরল রেখা আঁকো,' নিজেই আঁকল সে। 'কি, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, টেন্থ মেরিডিয়ান ধরে এগোচ্ছে ওরা।'

খুস্কায়েভের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তাহলে তো পানির

মত সহজ হয়ে গেল কাজটা। টেন্থ মেরিডিয়ান ধরে গেলেই...'

'চোপ!' মেঝেতে পা ঠুকে গর্জে উঠল কর্নেল। 'ফের যখন আমি কোন কাজে ডাকব, আসার আগে মাথাটা কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে নেবে। বুদ্ধিশুদ্ধি যাও একটু আছে, তাও শুষে নিচ্ছে চুলগুলো। আমাদের বোকা বানাবার জন্যে কোর্স বদল করবে ওরা, বুঝলে হাঁদারাম? হয় ওরা দক্ষিণ-দক্ষিণ-পুবে নাহয় দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যাবে।' রানার দলকে যেখানে দেখা গেছে সেখান থেকে দুটো আলাদা রেখা আঁকল সে। 'পরে আবার ওরা ফিরে আসবে দক্ষিণে। স্টার-ফিক্সে ভুল থাকবে ধরে নিয়ে, আইসফিল্ড ভেসে চলেছে মনে রেখে, ত্রিভুজ আঁকলাম, এর ভেতরই ওদের তুমি দেখতে পাবে।'

'জ্বী, কর্নেল কমরেড,' খুস্কায়েভ ঢোক গিলে বলল। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে...'

'আমার সব কথাতেই যুক্তি থাকে,' পিছন ফিরে জুনায়েভের দিকে তাকাল কর্নেল। 'এবার প্রত্যেক হেলিকপ্টারে সশস্ত্র লোক থাকবে।'

'কিন্তু সবগুলো হেলিকপ্টারে দেব কিভাবে? অত লোক...'

'আমি বলেছি সবগুলো হেলিকপ্টার ফিরিয়ে আনতে হবে?' মেঝেতে আবার পা ঠুকল কর্নেল। 'তা করলে জেনালের ফচ বুঝে নেবে তার ডিসেপশন অপারেশন ফেল মেরেছে। আই.আই. ফাইভের উত্তর আর পশ্চিম থেকে কয়েকটা রিফুয়েলের জন্যে ফিরে আসুক। দেরি না করে আবার ওগুলো টেক-অফ করবে, চলে যাবে আমার ত্রিভুজে নজর রাখার জন্যে।'

কর্নেল আবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠার আগেই তাড়াহুড়ো করে

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সবাই। পাইপ কামড়ে ধরে ওয়াল-ম্যাপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কর্নেল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'এবার কোথায় যাবে, মি. মাসুদ রানা? ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ দেখোনি!' ঠোঁটে নির্দয় একটুকরো হাসি ফুটে উঠল তার।

*

যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর রয়েছে ওরা। সারাক্ষণ রাশিয়ান হেলিকপ্টারের আওয়াজ আসছে কানে। কখনও একেবারে কাছে, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে মাথার ওপর চলে আসবে। কখনও অনেক দূরে, মৌমাছির গুঞ্জনের মত অস্পষ্ট। ক্লান্ত শরীর নিয়ে একের পর এক নালা ধরে এগোচ্ছে দলটা, পাশে প্রেশার রিজের আড়াল। এঞ্জিনের আওয়াজ যখন বহুদূরে, স্নায়ুর ওপর তখন যেন বেশি চাপ পড়ে—গভীর মনোযোগের সাথে, কান খাড়া করে শুনতে হয়। মনে হয়, না জানি কখন বাড়তে শুরু করে শব্দটা। কে জানে এদিকেই আসছে কিনা।

ওগুলো যখন কাছাকাছি চলে আসে, বিরতিহীন একঘেয়ে হয়ে ওঠে এঞ্জিনের আওয়াজ, কাঁপতে শুরু করে বরফ-পাঁচিল, নাড়া খায় পায়ের তলায় নালার বরফ। শুধু সময়ের ব্যাপার, জানে রানা, আগে হোক বা পরে রাশিয়ানদের চোখে ধরা ওদেরকে পড়তেই হবে। বিনয় আর নিয়াজের যুক্তি মেনে নিয়ে দলটাকে যদি দাঁড় করিয়ে রাখে ও, নালার ভেতর রাশিয়ানরা ওদেরকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু তাতে পিছিয়ে থাকতে হবে, কিউটের সাথে যোগাযোগের আশা ছেড়ে দিতে হবে।

কিউটে পৌঁছুতে পারলে নিরাপদ আশ্রয় মিলবে।

কিন্তু সচল বস্তু আকাশ থেকে সহজে চোখে পড়ে।

পিছিয়ে পড়ার চেয়ে রাশিয়ানদের চোখে ধরা পড়ার ঝুঁকিটাই নিচ্ছে রানা।

কিন্তু ক্লান্তি ওদেরকে ক্ষমা করছে না। সন্ধ্যা দশটার দিকে চারজনেরই ভেঙে পড়ার মত অবস্থা দাঁড়াল। হাত-পা আর চলে না, চোখ আধবোজা হয়ে আছে, শিরায় শিরায় অচল হয়ে পড়ছে রক্ত। এরই মধ্যে দু'বার কেঁদে ফেলেছে ইভেনকো রুস্তভ, রানার কাছে করুণ আবেদন জানিয়ে বলেছে, আর পারছে না।

কিন্তু রানা নির্মম। পরিষ্কার বলে দিয়েছে, 'হয় সাথে থাকুন, না হয় পথ হারিয়ে পটল তুলুন।'

জবাব শুনে চটে উঠল বিজ্ঞানী। স্লেজের সাথে ছুটতে ছুটতে বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো পাঠানোই হয়েছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে!'

মনে মনে বলল রানা, কিন্তু কথা ছিল কে.জি.বি. গোপনে সহযোগিতা করবে। অথচ তাদের টিকিটিরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। স্পেশাল সিকিউরিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও তারা দেয়নি, দিলে বলটুয়েভ গং এভাবে ওদের প্রাণের শত্রু হয়ে উঠত না। 'পরিস্থিতি বদলে গেছে, মি. ইভেনকো। প্রশ্ন এখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার। কাজেই ইচ্ছে হলে আসুন, না হয় থেকে যান–কোনটাতেই আমাদের আপত্তি নেই।'

ইভেনকো পিছিয়ে পড়ল, চট করে একবার পিছনে তাকিয়ে তাকে দেখে নিল রানা। বিনয়ের স্লেজের পাশে রয়েছে ইভেনকো, আগের মতই ছুটছে। ওদের পিছনে রয়েছে নিয়াজ, সেক্সট্যান্টের সাহায্যে তারাগুলোর অবস্থান জানার চেষ্টা করছে। ইভেনকোকে ফেলে রেখে যাবার কোন ইচ্ছেই নেই রানার, ভদ্রলোক অচল হয়ে

পড়লে বাধ্য হয়ে তখন স্লেজে তুলে নিতে হবে। তবে আশ্চর্য বটে, বরফে একাকী মরার ভয় দেখানোয় তার সমস্ত ক্লান্তি কোথায় যেন উবে গেল, স্লেজের সাথে দৌড়াতে আর কোন আপত্তি করল না।

কিন্তু স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সত্যিকার বিপদ হয়ে দেখা দিল, কেউ তার মেজাজকে বশে রাখতে পারছে না। মুখ খোলার উপায় নেই, তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ওঠে। রাত ঠিক দশটার পরপরই নিয়াজ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এবার তাদের থামতেই হবে। তার স্থির বিশ্বাস, রানার কথামত চললে নির্ঘাত মরতে হবে সবাইকে। যেভাবে হোক বোঝাতে হবে ওকে, ভাগ্য ওদের সাথে বেঈমানী করেছে, সামনে এগিয়ে আর কোন লাভ নেই। ব্যাগে সেক্সট্যান্ট ভরে বিনয়ের স্লেজ থেকে নামল সে, ছুটে চলে এল রানার স্লেজের পাশে। 'আরেকটা প্লেন আসছে, রানা,' বলল সে। 'থামো। রিজের মাথায় চড়ে দেখে আসি...'

'শুধু শুধু এনার্জি নষ্ট,' উত্তরে বলল রানা। 'প্লেনটা অনেক দূরে...'

'কিন্তু এদিকেই আসছে! আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছ না, আগের চেয়ে কাছে চলে এসেছে? মাথার ওপর না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ফর গডস সেক, কেন?'

হ্যান্ডেলবারটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল রানা, ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল, 'কারণ বলটুর খেলার ঘুঁটি হতে চাই না। কি ঘটছে বুঝতে পারছ না? এলোপাতাড়ি আসা-যাওয়া করছে ওরা, আন্দাজের ওপর। আমরা কোথায় ওরা জানে না।'

'এভাবে আসা-যাওয়া করতে করতেই দেখে ফেলবে...'

'ভাগ্য যদি খুব ভাল হয়। নালার ভেতর রয়েছি আমরা, কোন প্লেন কাছাকাছি চলে এলে পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াব। মাথার ওপর দিয়ে উঠে গেলেও দেখতে পাওয়া সহজ হবে না।'

'আর যদি দেখে ফেলে?'

'তখন ভাবব কি করা যায়।'

'ভাবলেও তখন কোন উপায় বেরুবে না।'

'বোকার মত কথা বলছ,' বলল রানা। 'বিপদ যত গুরুতরই হোক, উদ্ধার পাবার উপায় একটা না একটা থাকেই, তুমি সেটা দেখতে পাবে কিনা সেটাই হলো প্রশ্ন।'

রানার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল নিয়াজ, মনে হলো রানার এই গুণটা তার নিজের ভেতর থাকলে ভাল হত।

গভীর করে শ্বাস টানল রানা, নিয়াজের দিকে তাকাল। মুহূর্তের অন্যমনস্কতার জন্যে কাত হয়ে গেল স্লেজ, দু'হাতে হ্যাণ্ডেলবার টেনে ধরে কোন রকমে শেষরক্ষা করল। সামনের দিকে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, 'আরও অনেক দূর এগোতে হবে আমাদের, কর্নেল বলটু যাতে মনে করে অত দক্ষিণে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তার আগে বিশ্রামের কথা ভুলে যাও। জানি, হেলিকপ্টারগুলো আমাদের খুঁজছে। আমাদের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করাও ওদের একটা উদ্দেশ্য, এঞ্জিনের আওয়াজ কানে ঢুকলেই আমরা যাতে অস্থির হয়ে উঠি। প্রতিবার শব্দ শুনলেই আমরা যদি থামি, পিছিয়ে পড়ব না? ওরা চাইছেও ঠিক তাই। আমরা যাতে কিউটে পৌঁছুতে না পারি...' হেলিকপ্টারের আওয়াজ

হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেল রানা। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল, ‘আড়াল নাও!’

কুকুরগুলোকে দাঁড় করানো হলো, লম্বা হয়ে পাশে শুয়ে পড়ে বিনয় শান্ত করার চেষ্টা করল ওগুলোকে। কয়েক সেকেন্ড পরই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা হেলিকপ্টার, এঞ্জিনের আওয়াজে কানে তালা লাগার যোগাড় হলো। পুব থেকে পশ্চিমে, নালার দুশো ফিট ওপর দিয়ে কালো ছায়ার মত স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল। তারপরও স্থির হয়ে শুয়ে থাকল ওরা, জানে না শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেছে কিনা। ওদের দেখে থাকলে আবার ফিরে আসবে ওটা।

নড়াচড়া নেই, হিম শরীরের ভেতর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে অবশ, উঠে দাঁড়াবার শক্তি আছে কিনা সন্দেহ। হেলিকপ্টারের আওয়াজ দূরে সরে যেতে আবার অস্থির হয়ে উঠল কুকুরগুলো। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, হেলিকপ্টার ফিরে আসল না দেখে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ওরা। রানাকে আরেকবার বোঝাবার চেষ্টা করল নিয়াজ। ‘রানা, ভেবে দেখো। পেটে কিছু না পড়লে…’

রানা অন্যমনস্ক, চুপচাপ শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। কোন আওয়াজ পেল না ও। ক্লান্ত পা ফেলে বরফ-পাঁচিলের দিকে এগোল। পাঁচিলে ওঠার জন্যে বারবার চেষ্টা করল, প্রতিবার পা পিছলে নেমে এল নিচে। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এল নিয়াজ। পাঁচিলের মাথায় উঠল রানা। নাইট-গ্লাস পরিষ্কার করে চোখে তুলল। অনেক অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেল ও। ঝাপসা দিগন্তরেখার ওপর চোখ বুলাল, তারপর একটু

নিচু করল গ্লাস। ঝাড়া এক মিনিট পর ঘাড় ফিরিয়ে নালার দিকে তাকাল। 'উঠে এসো, নিয়াজ। দেখো।'

'খবর?' কর্নেল বলটুয়েভ জানতে চাইল।

'নেই।' খুস্কায়েভ ঘরের দরজা বন্ধ করল। 'এইমাত্র ফিরে এলাম—ওদের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল।'

'আশা ছেড়ে দেব, বলছ?' মেঝেতে পা ঠুকে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। জুনায়েভ তাকে চেনে, নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল সে। 'তুমি একটা কাপুরুষ, খুস্কায়েভ। একটা ডিটাচমেন্টের লীডার হবার যোগ্যতা তোমার নেই। এই খেলায় যে সবচেয়ে বেশি দূর যেতে পারে সে-ই জেতে। ঝামেলা শেষ হলে তোমার চাকরি নিয়ে মাথা ঘামাব আমি। নিশ্চয়ই খেতে যাচ্ছ? ভুলে যাও, খুস্কায়েভ। পরবর্তী যে হেলিকপ্টার টেক-অফ করছে ওটায় থাকছ তুমি।' খুস্কায়েভ ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। 'ওরা কিউটে পৌঁছে গেলে ব্যাপারটা সত্যি জটিল হয়ে উঠবে, জুনায়েভ।'

থতমত খেয়ে গেল জুনায়েভ। এই প্রথম কর্নেল কমরেড আশঙ্কা প্রকাশ করল, জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছুনো রানার পক্ষে অসম্ভব নয়। 'জটিল, কমরেড কর্নেল?' জিজ্ঞেস করল সে, তারপর বলল, 'ইভেনকো যদি কোন আমেরিকান জাহাজে একবার চড়তে পারে, তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।'

'অসম্ভব?' ঠাণ্ডা গলায় বলল কর্নেল, মাথা নাড়ল। 'আমি তা মনে করি না। ঝামেলা হবে, কিন্তু অসম্ভব নয়।'

সরাসরি তর্কে না গিয়ে মিনমিন করে জুনায়েভ বলল, ‘ভাগ্য যদি আমাদের সাহায্য করে...’

‘ভাগ্যের আমি নিকুচি করি!’ গর্জে উঠল কর্নেল। ‘তুমি জানো না, নিজের ভাগ্য নিজে গড়ি আমি?’ টেবিলে দুম করে একটা ঘুসি মারল সে। ‘কৌশল বদল করছি। এখন থেকে কিউটের উত্তর দিকটায় চোখ রাখব। যে-পথ দিয়ে কিউটের দিকে আসবে ওরা। টার্গেটকে দেখামাত্র কাছাকাছি, নিরাপদ দূরত্বে ল্যান্ড করবে আমাদের হেলিকপ্টার। নিচে বরফ নরম কি শক্ত জানতে চাই না আমি। যেভাবে পারে ল্যান্ড করতে হবে।’

‘ইভেনকোর সাথে যারা আছে তারা যদি বাধা দেয়?’

‘সেজন্যেই আমার দ্বিতীয় নির্দেশটা এখুনি সবাইকে জানিয়ে দেবে তুমি। সশস্ত্র প্রতিটি দলের লীডারকে ব্যক্তিগতভাবে জানাবে। খবরদার, পাইলট যেন শুনতে না পায়। ইভেনকোর সাথে যারা আছে তাদের আমরা চাই না। তারা ঝামেলা, কাজেই হারিয়ে গেলে আমরা খুশি হব। সহজ সমাধান, বরফের নিচে পুঁতে ফেলা। সবচেয়ে ভাল হয় যদি গভীর কোন ফাটল পাওয়া যায়—লাশগুলো নিচে ফেলে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কুকুরগুলোকেও মারতে হবে, বিষ মেশানো খাবার দিয়ে। স্লেজ দুটোরও কোন অস্তিত্ব রাখা চলবে না। মাঝরাতের মধ্যে, জুনায়েভ! যদি সম্ভব হয় তারও আগে...’

নিশ্চয়ই মরীচিকা, প্রথমবার দেখে ভাবল রানা। আকৃতিটা ঝাপসা হয়ে উঠল, তারপর আর দেখা গেল না। লেন্স অ্যাডজাস্ট করতে আবার ফিরে এল। না, দৃষ্টিভ্রম নয়। নিয়াজকে পাঁচিলের ওপর

উঠতে বলল ও।

রানার শান্ত গলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, বরফের পিছলা ঢাল বেয়ে কিভাবে যে মাত্র একবারের চেষ্টায় পাঁচিলের মাথায় উঠে এল, বলতে পারবে না নিয়াজ। চোখে গ্লাস তোলার জন্যে হুড নামাল মুখ থেকে।

‘ওদিকে! দেখে বলো, ভৌতিক কিছু না তো?’

নাইট-গ্লাস ধরা আঙুলগুলো কাঁপছে নিয়াজের। সামনে আরও তিন মাইল প্রেশার রিজ ঢেউ খেলে রয়েছে, যেন ঝড়ের ছোবল খেয়ে ফুঁসে ওঠা সাগর আচমকা মাঝপথে জমাট বরফ হয়ে গেছে। আরও সামনে সমতল বরফের বিস্তার, তারই মাঝখানে গেঁথে রয়েছে মরীচিকা–চাঁদের আলোয় এমন একটা দৃশ্য, ফটো তোলা হলে অবাস্তব দেখাবে। ‘গুড গড!’ স্তম্ভিত নিয়াজ ফিসফিস করে উঠল।

উঁচু মাস্তুল আর উঁচু ব্রিজ নিয়ে একটা জাহাজ বরফ আর তুষারে তৈরি। দেখতে অনেকটা জন্মদিনের কেকের মত, নাইট-গ্লাসে নিয়াজ দেখল, জাহাজের বো ওর দিকে তাক করা রয়েছে। গোটা জাহাজ চকচক করছে, যেন সাদা কাঁচে মোড়া। মাস্তুল থেকে বরফের ঝুরি ডেক পর্যন্ত নেমে এসেছে। বো-টা অস্বাভাবিক উঁচু, যেন বিশাল কোন ঢেউয়ের মাথায় চড়ে রয়েছে। কিন্তু জাহাজটা সম্পূর্ণ স্থির, পোলার প্যাকে শক্তভাবে গাঁথা। ওটা যে পরিত্যক্ত নয় তার একমাত্র প্রমাণ, মাস্তুলের ডগায় আলো জ্বলছে। মরীচিকা হতেই পারে না। আমেরিকান আইসব্রেকার কিউট ওটা, সবচেয়ে কাছের সাগর থেকে দশ মাইল দূরে চলে এসেছে, আটকা পড়েছে পোলার প্যাকে।

‘গুড গড!’ আবার বিড়বিড় করে উঠল নিয়াজ।

‘রিপিট করছ কেন, বুড়ো হয়ে যাচ্ছ নাকি?’

এক পাক নেচে উল্টোটা প্রমাণ করল নিয়াজ।

‘সবিনয়ে জানতে চাইছ,’ নিচে থেকে জিজ্ঞেস করল বিনয়, ‘...’

‘আবে হালা অহনও বুঝবার পারো নাই? হালায় কিউট বরফের মইদ্যে...’

কুকুরগুলোর কাছে ইভেনকো রুস্তভকে রেখে পাঁচিলে উঠল বিনয়। ‘যদি ঠাট্টা হয় রে !’

নাইট-গ্লাসটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিয়াজ বলল, ‘নিজের চোখেই দেখ।’

গ্লাস চোখে তুলল বিনয়, এক সেকেন্ড পর সবিস্ময়ে বলল, ‘এত ভেতরে ওটা ঢুকল কিভাবে?’

‘ঢোকেনি, ঢোকানো হয়েছে,’ বলল রানা। ‘শক্তির নাম সাহস। ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যানের সাথে আমার পরিচয় নেই, তবে শুনেছি তাঁর সাহসের তুলনা হয় না। আমাদের কাছাকাছি আসার জন্যে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি বরফ ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার কি বলো তো? জাহাজের রাডার দেখা যাচ্ছে না।’

‘লোকটা যে বেপরোয়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই,’ বলল নিয়াজ। ‘কত দূরে, আন্দাজ করতে পারো?’

‘সাত মাইলের কম নয়,’ বলল রানা। ‘এগোনোর ব্যাপারে আর কোন আপত্তি আছে?’

প্রথম দু’মাইল ঝড়ের বেগে এগোল ওরা, গত কয়েক ঘণ্টায়

এই গতি একবারও তুলতে পারেনি। সামনে আর এক মাইল দুর্গম পথ, তারপরই খোলা, সমতল বরফের বিস্তার। মাথার ওপর রাশিয়ানদের হেলিকপ্টার নেই, কাজেই রানা সিদ্ধান্ত নিল ইলিয়ট হোমিং বীকন অন করে সিগন্যাল পাঠানো যেতে পারে। সিগন্যাল পেলেই হেলিকপ্টার পাঠাবে কিউট।

পরিশ্রান্ত বলেই কনকনে ঠাণ্ডা অসহ্য হয়ে উঠল। চারদিক এখনও পরিষ্কার, শুধু স্লেজ-টীমের মাথার ওপর ঝুলে আছে হালকা কুয়াশা, ধোঁয়াটে বাষ্পের মত। জনপ্রিয় ধারণা, আর্কটিকে চব্বিশ ঘণ্টা ঝড়-ঝঞ্ঝা লেগে আছে, এই অক্ষাংশে তা সত্যি নয়। এ শুধু পৃথিবীর শীতলতম জায়গার একটা।

একটা নালার ভেতর থামল ওরা। বিনয় সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, এই গোলকধাঁধায় হেলিকপ্টার নামতে পারবে না। তবু নিয়াজকে ট্র্যান্সমিটার বের করার নির্দেশ দিল রানা। 'ওরা একজন একজন করে আমাদের তুলে নেবে, বিনয়,' ব্যাখ্যা করল ও। 'তারপর কুকুরগুলোকে খোলা বরফে নিয়ে যাব আমি।' ক্যানভাসের ভেতর থেকে ট্র্যান্সমিটার বের করছে নিয়াজ, নালার ঢাল বেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে এল ইভেনকো। ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ইভেনকো হাঁপাচ্ছে। রানার মুখের কাছে হাত নেড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'আর যখন বিপদের কোন ভয় নেই, এবার আমার সম্পত্তি আমাকে ফিরিয়ে দিন!'

'মানে?' চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা, ডান বুটের ডগা দিয়ে বরফে খোঁচা মারছে। তেমন শক্ত মনে হলো না। বোধহয় ওর সন্দেহই ঠিক, নালাটার দু'পাশে প্রেশার রিজ খুব বেশি দিন আগে তৈরি হয়নি। এখানে মস্ত একটা ফাটল ছিল,

সেটা বন্ধ করে মাথাচাড়া দিয়েছে বরফ-পাঁচিল।

‘আমার টিউব! তোমরা আমার টিউব চুরি করেছ!’ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ল ইভেনকো, পারকার পকেট থেকে ভারী একটা টিউব বের করে রানার মুখের সামনে নাড়ল।

‘আপনার হাতেই তো রয়েছে ওটা,’ বলল রানা, বুটের ডগা হঠাৎ করে বরফের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে ভুরু কুঁচকে উঠল। গর্ত থেকে বুট তোলার পর দেখা গেল ডগা থেকে কালচে পানি ঝরছে। নরম বরফ এখানে। ইভেনকো এতই উত্তেজিত যে ব্যাপারটা লক্ষই করল না।

‘এটা সেই টিউব নয়…!’

‘আরেকটার কথা বলছেন, যেটার ভেতরে মেরিলিন চার্ট ছিল?’ সরাসরি ইভেনকোর দিকে তাকাল রানা। ‘ওটা আমাদের কাছে থাকাই নিরাপদ। শুধু শুধু চেঁচামেচি করবেন না।’

‘তারমানে? আমার জিনিস…’

তাকে বাধা দিয়ে রানা বলল, ‘কথা না বাড়িয়ে নিয়াজকে একটু সাহায্য করবেন, প্লীজ?’

ট্র্যানসিভার কাঁধে নিয়ে নালা ধরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে নিয়াজ, সমতল কোন জায়গার খোঁজে। এরইমধ্যে অনেক দূর চলে গেছে সে। জিনিসটা ভারী, বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। সাবধানে পা ফেলছে সে, পিছলা ঢালে পা হড়কালে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আরও খানিকদূর এগোবার পর একদিকের পাঁচিলের গায়ে একটা ফাঁক দেখল সে, মেঝেটা সমতল। ধীরে ধীরে ফাঁকের মাঝখানে ট্র্যানসিভার নামাল। রানার সামনে দাঁড়িয়ে তখনও ঘ্যান ঘ্যান করছে ইভেনকো।

‘এরকম একটা অন্যায় আমি মেনে নেব কেন? আমার জিনিস আপনারা কেন লুকাবেন? ওটার জন্যেই ওয়াশিংটনে আমার দাম…’

রানার মুখের সামনে টিউবটা নাড়ছে ইভেনকো, বিনয়ের সহ্য হলো না। ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল সে, বলল, ‘দাম? কিউটে না ওঠা পর্যন্ত কারও এক কানাকড়ি দাম নেই। রানার মুখের সামনে টিউবটা নাড়ছেন, এর মানে কি? স্বাভাবিক ভদ্রতা কাকে বলে তাও ভুলে গেছেন? যান, নিয়াজের সাথে ধরাধরি করে ট্র্যান্সমিটারটা নিয়ে আসুন।’

‘তোমরা আমেরিকান নও, অথচ…,’ গজগজ করতে করতে চলে গেল ইভেনকো।

নিচু গলায় রানা বলল, ‘বিনয়, পায়ের নিচে নরম বরফ। সাবধানে থাকতে হবে।’

‘নরমই তো হবার কথা,’ বলল বিনয়। ‘সাগরের কাছাকাছি চলে এসেছি না!’

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল ইভেনকো। দু’জনেই ওরা ঝট্ করে সেদিকে তাকাল। আছাড় খেয়ে পড়ে গেল ইভেনকো। প্রায় সাথে সাথে উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পড়ে গেল আবার। ‘সেরেছে!’ অসহায় বোধ করল রানা। ‘ভদ্রলোকের গোড়ালি ভেঙে গেছে।’

সিগন্যাল পাঠাবার জন্যে তৈরি হয়েছে নিয়াজ, ইভেনকোর চিৎকার শুনে সেট ফেলে ছুটে এল।

হাড় না ভাঙলেও, মারাত্মক চোট পেয়েছে ইভেনকো–গোড়ালিতেই। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে চেহারা, ফোঁপাচ্ছে। নিয়াজ তার বগলের নিচে হাত গলিয়ে বসার ভঙ্গিতে

খানিকটা তুলল, তারপর টেনে নিয়ে এল পাঁচিলের কাছে। পাঁচিলে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল ইভেনকো। একটা গর্তে পা দেবে গিয়েছিল, বুট থেকে কালচে পানি ঝরছে। মুখ তুলে রানা আর বিনয়ের দিকে তাকাল নিয়াজ। 'রানা! এদিকে নরম বরফ! মি. ইভেনকোর গোড়ালি মচকে গেছে, হাঁটতে পারবেন না!'

ছুটল বিনয়। ধরাধরি করে একটা স্লেজে তোলা হলো ইভেনকোকে। রানাও পৌঁছুল। চেহারায় ব্যথা আর অভিমানের ছাপ নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল ইভেনকো, রানার দিকে তাকাবে না।

'সিগন্যাল পাঠানোটা জরুরী,' মনে করিয়ে দিল রানা।

ঢাল বেয়ে আবার উঠতে শুরু করল নিয়াজ, সাথে বিনয়। দেখেশুনে পা ফেলছে ওরা, বরফের পাতলা আবরণে পা পড়লে চিরকালের জন্যে সাগরের অতলতলে তলিয়ে যেতে পারে। পাঁচিলের ফাঁকটার কাছে পৌঁছে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল নিয়াজ। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? পরমুহূর্তে গলা থেকে দুর্বোধ্য একটা হাহাকার ধ্বনি বেরিয়ে এল। পিছিয়ে পড়েছিল বিনয়, ছুটল সে। রেডিফন সেট নরম বরফে ডুবে গেছে। ট্র্যান্সমিটারের প্রায় সবটুকু অদৃশ্য হয়েছে, ওপরে খাড়া হয়ে রয়েছে শুধু এরিয়াল। বরফে হাঁটু গেড়ে বসল নিয়াজ, পাগলের মত হাত দিয়ে বরফ খুঁড়তে শুরু করল। ট্র্যান্সমিটার বেরুল না, গাদা গাদা বুদ্বুদের সাথে উঠে এল কালচে পানি। ভেতরে দস্তানা পরা হাত গলিয়ে দিয়েও ট্র্যান্সমিটারের স্পর্শ পেল না সে। মরিয়া হয়ে এরিয়াল ধরে টান দিল, মট্ করে ভেঙে গেল সেটা। চারপাশ থেকে কাদাটে বরফ এসে বন্ধ করে দিল ফাঁকটা।

একমাত্র ট্র্যান্সমিটারটা গ্রাস করল প্রকৃতি। কিউটের সাথে যোগাযোগ করার আর কোন উপায় থাকল না।

‘মৌচাকের ব্যবস্থা করেছ?’ ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। পোলার প্যাক থেকে হাজার ফিট ওপরে অস্থায়ী হেডকোয়ার্টারে বসে রয়েছে সে। সাবমেরিন কিলার দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে। খুস্কায়েভের হেলিকপ্টার রয়েছে আরও দক্ষিণে, রেডিও-টেলিফোনে তার সাথে সরাসরি কথা হচ্ছে বলে কিউটের ছদ্মনাম মৌচাক ব্যবহার করছে ওরা।

‘মৌচাককে স্যান্ডউইচ বানানো হয়েছে,’ জবাব দিল খুস্কায়েভ।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল কর্নেলের গলা থেকে, সেট অফ করে দিয়ে নিচে বরফের দিকে তাকাল সে। তার ধারণা, ঘটনা প্রবাহ নাটকীয় মোড় পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুত, ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকার একটা তাগাদা অনুভব করছে সে। ‘মাঝরাতের মধ্যে আমরা মুঠোয় পাব ওদের,’ আপনমনে বিড়বিড় করল।

জুনায়েভের স্বভাবই হলো খারাপ দিকগুলো আগে চিন্তা করা। ‘কিন্তু এখনও ওদের দেখতে পাইনি আমরা।’

জুনায়েভকে থামাবার জন্যে চোখ গরম করে তাকাল কর্নেল। শব্দজটে কান ঝালাপালা হলো তার। চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে মেসেজটা রিসিভ করল সে। তারপর পাইলটের দিকে তাকাল। ‘আরও জোরে চালাতে পারো না, নাকি বরফে নোঙর ফেলে আছ?’ ঝট্ করে জুনায়েভের দিকে ফিরল সে। ‘মাঝরাতের মধ্যে,

বলিনি? এইমাত্র টার্গেট দেখতে পেয়েছে ওরা।'

'রানা! শকুনটা ল্যান্ড করতে আসছে!'

'জানতাম।' বরফ-পাঁচিলের ওপর থেকে চোখ কুঁচকে তাকাল রানা, পরিষ্কার দেখল সাবমেরিন কিলার নিচে নামছে। এখান থেকে আধ মাইল দূরে, সমতল বরফের ওপর ল্যান্ড করতে যাচ্ছে ওটা।

শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেছে ওরা। এর আগে হেলিকপ্টারটা দু'বার উড়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে। নামার জন্যে ভাল জায়গা বেছে নিয়েছে রুশ পাইলট, কিউট আর ওদের মাঝখানে। চোখ থেকে গ্লাস নামাল রানা। ঘুঁটি আরও একটা চেলেছে কর্নেল বলটুয়েভ—বরফ মোড়া জাহাজের মাস্তুলের কাছাকাছি ঝুলে রয়েছে দ্বিতীয় সাবমেরিন কিলার, কিউট থেকে যাতে কোন হেলিকপ্টার টেক-অফ করতে না পারে।

'প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম,' রানার একপাশ থেকে তিক্ত গলায় বলল বিনয়। 'আর ঘণ্টা দুই সময় পেলেই...'

রানার আরেক পাশে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে নিয়াজ। থমথম করছে তার চেহারা।

'দুঃখে কাতর হয়ে কোন লাভ নেই,' বলল রানা। 'কি করতে হবে আমি জানি।'

কুকুরগুলো হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠায় তাড়াহুড়ো করে নালায় নেমে গেল বিনয়। প্রথম সাবমেরিন কিলার এখনও নামছে, এঞ্জিন আর রোটরের আওয়াজ প্রেশার রিজে বাড়ি খেয়ে দিগ্বিদিক্ ছুটোছুটি শুরু করল। ধীরে ধীরে বরফে নামল সেটা, রোটর

ঘুরছে। দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে নিচের বরফে নামল লোকজন, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। পারকা পরা বেঢপ আকৃতি নিয়ে, চাঁদের আলোয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তারা, এগিয়ে আসছে প্রেশার রিজগুলোর দিকে। অপারেশনের দ্রুতগতি আর সুশৃঙ্খল ভাব লক্ষ করে আবার মুগ্ধ হলো রানা।

'এত লোক!' নিজের অজান্তেই একটা ঢোক গিলে বলল নিয়াজ। 'আমার ধারণাই ছিল না সাবমেরিন কিলারে এত লোক ধরে।'

'কি করতে হবে তুমি জানো,' নিয়াজকে মনে করিয়ে দিল রানা। 'ইভেনকোর ওপর কড়া নজর রাখবে। এখন যদি ভদ্রলোক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, মাথায় বাড়ি।'

'রানা, আরেকবার ভেবে দেখো। তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ না তো!'

'ওদের আসার অপেক্ষায় বসে থাকলে সবাইকে মরতে হবে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ওরা শুধু ইভেনকোকে নিতে এসেছে, আমাদের নাম খরচের খাতায় টুকে রাখবে।'

বরফ-পাঁচিল থেকে পিছলে নেমে এল রানা, হাতে রাইফেল নিয়ে নালা ধরে ছুটল। পিছন থেকে সবাই তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিনয় আর ইভেনকোকে নির্দেশ দিল নিয়াজ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যে-যার কাজে মন দিল ওরা।

দু'পাশে বরফ-পাঁচিল উঁচু হয়ে থাকলেও মাথা নিচু আর শিরদাঁড়া বাঁকা করে ছুটছে রানা। সামনে নরম বরফ থাকলে বিপদ হবে, জানে, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না। জরুরী অবস্থায় সমস্ত ক্লান্তি কোথায় যেন উবে গেছে, নিজেকে সতেজ আর প্রাণবন্ত

লাগছে ওর। ভাবনা-চিন্তায় কোন জড়তা নেই, হাত-পায়ের ওপর রয়েছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। 'আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ না তো,' কথাটা মিথ্যে বলেনি নিয়াজ–সোজা রাশিয়ানদের দিকে ছুটছে রানা।

ঝুঁকি নিচ্ছে রানা, কিন্তু বোকার মত নয়। এ-ধরনের সঙ্কটে অনেকের বুদ্ধি খোলে, কিন্তু সাহসের অভাব দেখা দেয়। রানা সাহসী যুবক, ওর রক্তে রয়েছে ঝুঁকির নেশা। একা নিজের কথা ভাবতে অভ্যস্ত নয়, সেজন্যেই কঠিন যে-কোন অভিযানে ওকেই নেতৃত্ব দেয় মানুষ। ইভেনকো সহ সহকর্মীদের প্রাণ বাঁচাবার দায়িত্ব রয়েছে ওর কাঁধে। কাজেই শত্রুদের বাধা দেয়ার জন্যে সহজ বুদ্ধিটা কাজে লাগাচ্ছে ও। নালা এদিকে একটা নয়, অসংখ্য। রাশিয়ানরা একটা ধরে আসবেও না। সাবমেরিন কিলার থেকে বিশজনকে নামতে দেখেছে ও, তাদের সবার সামনে একা ওকে দাঁড়াতে হবে না। বিস্ময়ের ধাক্কায় শত্রুপক্ষ ঘাবড়ে যাবে, এই ভরসায় ছুটছে রানা। রাশিয়ানরা জানে সংখ্যায় ওরা মাত্র চারজন, জানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ছোট্ট দলটা। এই পরিস্থিতিতে ওদের একজন তাদের দিকে ছুটে আসবে কল্পনা করা যায় না।

এঁকেবেঁকে, ঢালু হয়ে এগিয়ে গেছে নালা। খানিক পরপরই বাঁক নিতে হলো, কিন্তু ছোটার গতি কমল না। পাঁচিলের মাথা থেকে নালাগুলো দেখে নেয়া আছে, রানা জানে সবগুলোই গিয়ে মিশেছে বরফের সমতল বিস্তারে। কোথাও কোথাও হিম করিডর গাঢ় ছায়ায় ঢাকা, কোথাও বাঁক নিলেই গায়ে জড়াচ্ছে চাঁদের কোমল আলো। একটু পরই গতি মন্থর করতে হবে ওকে, কারণ এগিয়ে আসা রাশিয়ানদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে ও। ছুটছে,

সেই সাথে হেলিকপ্টার এঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ শুনছে। পাইলট কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না, আবার চালু নাও হতে পারে ভেবে এঞ্জিন বন্ধই করেনি সে।

থামল রানা, তারপর সাবধানে, এক পা এক পা করে এগোল। রাশিয়ানদের সাথে দেখা হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। দেয়াল ঘেঁষে এগোল ও, ফাঁক-ফোকরগুলো ভাল করে দেখে রাখছে–গা ঢাকা দেয়ার দরকার হলে কাজে লাগবে। অবশ্য আগেভাগে যদি পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় তবেই লুকোবার সুযোগ মিলবে। ওরা যে অ্যামেচার, কোন সন্দেহ নেই। সোভিয়েত স্পেশাল সিকিউরিটি ডিটাচমেন্টগুলোকে আর্কটিকে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হলেও, পোলার প্যাকে পায়ে হেঁটে অভিযানে বেরুবার ট্রেনিং দেয়া হয়নি। দু'হাতে রাইফেলটা ধরে আছে রানা, বাঁক নিয়ে সামনে বেরিয়ে এল রুশ সৈনিক।

দু'জনেই চমকাল। কিন্তু রাশিয়ান লোকটা হেলিকপ্টারের এত কাছাকাছি কাউকে দেখতে পাবে বলে আশা করেনি। সে তার অটোমেটিক রাইফেল কাঁধে রেখেছে। কাঁধ থেকে সেটা নামাতে যাওয়াই তার ভুল হলো। রানার মাথায় কোন চিন্তা খেলে যাওয়ার আগেই শরীরে খেলে গেল বিদ্যুৎ। রাইফেলটা হাতে ঘুরে গেল, ভারী বাট-প্লেট রুশ সৈনিকের মুখের দিকে তাক করে ধরল ও। চ্যাপ্টা বাঁটটাকে আসতে দেখল লোকটা, ঠিক মাথা বরাবর। শেষ মুহূর্তে মাথা ঝাঁকিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল সে, মাথা বাঁচলেও, মুখ বাঁচল না। নাকের পাশে আর চোয়ালে রাইফেলের বাঁট পড়ল, ধাক্কা খেয়ে বরফের ওপর আছাড় খেলো সে। সামনে বাড়ল রানা।

চিৎ হয়ে পড়েছে লোকটা, বরফে ঠুকে গেছে মাথার পিছনটা।

তবে ফার হুডে মাথা ঢাকা থাকায় মোটেও ব্যথা পায়নি। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল, হাতের রাইফেল ছিটকে পড়েছে দূরে। রানার বুট পরা পা তার মুখের সামনে থামতেই দু'হাত দিয়ে একটা পা জড়িয়ে ধরল সে। তারপর হ্যাঁচকা একটা টান দিল একপাশে।

রাইফেলের বাঁটটা খাড়াভাবে সজোরে নামাল রানা। শক্ত কপালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল বাঁট। রানার পা জড়িয়ে ধরা হাত দুটো নিথর হয়ে গেল। অজ্ঞান লোকটাকে পরীক্ষা করল রানা। মারা যাবার সম্ভাবনা কম। তবে জ্ঞান ফিরে পেতে সময় নেবে। ওর সঙ্গীরা আঘাতগুলো দেখে ধরে নেবে পা পিছলে শক্ত বরফে আছাড় খেয়েছে। অবশ্য যদি খুঁজে পায়। বুটের ধাক্কায় লোকটাকে উপুড় করল রানা।

এরপর আরও বড় ঝুঁকি নিল ও, আবার ছুটতে শুরু করল সামনের দিকে। শত্রুপক্ষের কৌশলটা আন্দাজ করে নিয়েছে রানা। বিশজন সশস্ত্র লোক ছড়িয়ে পড়েছে খোলা বরফ প্রান্তরে, দশ-বারোটা নালা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে তারা। কেউ যদি ফেরারীদের দেখতে পায়, ফাঁকা গুলি করে বাকি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সাথে সাথে আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে এসে ছোট্ট দলটাকে ঘিরে ফেলবে তারা। সামনে বাঁক দেখেও ছোটার গতি কমালো না রানা, বাঁক নেয়ার সাথে সাথে এক ফালি আলো দেখতে পেল সামনে। নালা থেকে বেরুবার পথ পেয়ে গেছে ও, সামনে খোলা বরফের বিস্তার।

মাত্র একশো গজ দূরে সাবমেরিন কিলার, জোড়া ফিন রানার দিকে মুখ করা। পাইলটের কেবিন রয়েছে উল্টোদিকে। রোটরের আওয়াজে কান ঝালাপালা। নালা থেকে উঁকি দিয়ে বাইরেটা

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখে নিল রানা। খোলা জায়গায় কোন পাহারাদার নেই। বিশজনের একটা দল চারজনকে ধরতে যাচ্ছে, কল্পনাতেও ঠাঁই পায়নি চারজনের একজন বিপদ হয়ে এগিয়ে আসতে পারে। সরাসরি হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটা ধরল রানা।

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে ও, দৃঢ় কিন্তু শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে সাবমেরিন কিলারের পিছনটা। কাজটা এক ধরনের পাগলামি হয়ে যাচ্ছে, জানে রানা। পাইলট পিছন দিকে তাকাবে না এটা ধরে নিয়ে জুয়া খেলছে ও। পাইলট যদি তাকায়ও, ওকে হাঁটতে দেখে ততটা সতর্ক হবে না যতটা সতর্ক হবে ওকে ছুটতে দেখলে। শুধু একটা লিভার টানার অপেক্ষা, সাথে সাথে খাড়াভাবে আকাশে উঠে যাবে হেলিকপ্টার। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের ব্যাপার। হাঁটার গতি আরও কমিয়ে দিল রানা।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসে রানার মনে হলো, ভাগ্য আজ প্রসন্ন। ওর প্ল্যান সফল হতে যাচ্ছে। ফার হুড আর পারকা হুবহু রাশিয়ানদের মত দেখতে না হলেও, মিল আছে। অমিল যে-টুকু আছে, চাঁদের আবছা আলোয় পাইলটের চোখে পড়ার কথা নয়। যত কাছে চলে এল ততই বাড়তে লাগল রোটরের আওয়াজ, ততই দৌড়ের ঝোঁক চাপল শিরায় শিরায়। আর বিশ গজ বাকি। রানার প্রতিটি পেশী, প্রতিটি লোমকূপ নিঃশব্দে চিৎকার করছে। কিন্তু তবু রানা শান্ত, খানিকটা অলস ভঙ্গিতে হাঁটতেই লাগল। সাবমেরিন কিলারের লেজটা পুরানো ধাঁচের, আগেকার দিনে বাইপ্লেনে যেমন থাকত। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে লেজটাকে পাশ কাটাল রানা। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ধাপ বেয়ে

উঠল। দম বন্ধ। বিপজ্জনক কিছু ঘটলে এখনই ঘটবে। বরফের পাতলা আবরণে মোড়া রয়েছে কেবিনের জানালা। দস্তানা পরা হাত মুঠো করে জানালায় আঘাত করল ও।

হেলিকপ্টারের সাথে রানাও কাঁপছে। জানালায় ঘুসি মারায় কোন লাভ হলো না। দ্বিতীয়বার আঘাত করল রানা। মাথা নিচু করে আছে ও, জানে ভেতর থেকে কাঁচের ওপর নাক ঠেকিয়ে ওকে দেখার চেষ্টা করবে পাইলট। নিজেদের লোক নয় বুঝতে পারলে খুন করার জন্যে খেপে উঠবে।

স্যাঁৎ করে একপাশে সরে গেল জানালা, অমনি রাইফেলের নলটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল রানা। গরম বাতাস লাগল মুখে। হেলমেট পরা একটা ফার মোড়া মূর্তি সীটের ওপর পিছিয়ে গেল। 'বেরোও!' রুশ ভাষায় বলল রানা, রোটরের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর চিৎকার। 'তা না হলে গুলি খেয়ে মরো! জলদি!' শুধু মুখে নয়, ইঙ্গিতেও লোকটাকে কন্ট্রোল কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার তাগাদা দিল রানা। জানালার ফ্রেমে হেলান দিল ও, রাইফেলের মাজ্‌ল্ ঠেকাল লোকটার পাঁজরে। রুশ পাইলট গগলস পরে আছে, তবু চোখ দেখে তাকে যুবক বলেই মনে হলো। পঁচিশ, তার বেশি বয়স হবে না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, এই বয়সেই বীরত্ব দেখাবার ঝোঁক থাকে। একটা লিভারের দিকে হাত বাড়াল পাইলট।

লিভারে টান পড়লেই বরফ ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়বে সাবমেরিন কিলার। ঝুলে থাকতে হবে রানাকে। কিংবা ঝাঁকি খেয়ে নিচের বরফে পড়ে যাবে, সেই সাথে সাঙ্গ হবে ভবলীলা। ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়িয়ে গর্জে উঠল ও, 'গুলি করলাম!'

মৃত্যু ভয় বড় ভয়। পাইলটের হাত স্থির হয়ে গেল। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি সে। লোকটা কি ভাবছে পরিষ্কার ধরতে পারল রানা। আড়চোখে পাশে তাকাল সে, মাজ্‌ল্‌টা দেখে নিল। ভাবছে, গুলি খেয়েও বাঁচার আশা আছে কিনা। ক্যালিবার দেখে ভয় পেল সে, লিভার থেকে সরিয়ে আনল হাত। 'দাঁড়াও! বেরোও!' হিংস্র হয়ে উঠেছে রানা। নালা থেকে ওদের কেউ বেরিয়ে এলেই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। হেলিকপ্টারের জানালায় ঝুলে থাকা একজন লোককে গুলি করে মারা ডালে বসে থাকা পাখি শিকারের চেয়েও সহজ।

যেন পরাজয় স্বীকার করে নিয়েই হেডসেট খুলে ধীরে ধীরে সীট ছাড়ল পাইলট। তার শান্ত ভঙ্গি সতর্ক করে দিল রানাকে।

সীট থেকে খানিকটা উঠে লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল পাইলট, গগলসে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের আলো পড়ায় চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে না। 'বেরিয়ে এসো,' কর্কশ গলায় বলল রানা। 'তাড়াতাড়ি করো!' পাইলট কাছে সরে এল, সেই সাথে রাইফেলটা একটু একটু করে নিজের দিকে টেনে নিল রানা, বাঁটটা ঢুকে যাচ্ছে বগলের তলায়। এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে দরজার হাতল ধরে আছে ও। ট্রিগার গার্ডে আঙুল। হাতলে ঠেলা দিতেই দরজা একপাশে সরে যেতে শুরু করল। ধীর, অলস ভাবে হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিল পাইলট, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে।

আস্তে আস্তে রানা আর দরজার দিকে এগিয়ে এল পাইলট। একটু পাশ ফিরল, যেন রানার ইঙ্গিতে লাফ দিয়ে বরফে নামতে যাচ্ছে। তারপর, ঘুরন্ত রোটরের তলা থেকে লাফ দিল সে। লাফ দিল বরফের দিকে নয়, রানার রাইফেল লক্ষ্য করে।

তৈরি ছিল রানা, কিন্তু শুধু আত্মরক্ষার জন্যে। এরকম একটা ব্যাপার ঘটে যাবে, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। ঝট্ করে একপাশে সরে গিয়ে, দরজার হাতল ধরে ঝুলে পড়ল ও। ওকে পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল পাইলট, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাল হারিয়ে ফেলল। দরজা দিয়ে বেরুল সে খাড়া ভাবে, পুরোপুরি সিধে অবস্থায়। নিজের রোটরে গলা পেতে দিল লোকটা। ইস্পাতের ঘুরন্ত পাত জবাই করল তাকে।

ঝুলন্ত অবস্থায় নিচের দিকে তাকিয়ে বমি পেল রানার। পেট, গলা, আর গালের পেশীগুলোর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না। পরপর কয়েকটা জোরাল ঢোক গিলে বমি ভাবটাকে ঠেকাল বটে, কিন্তু মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। ধড়টা নিচে বরফে পড়ে আছে। সাদা বরফে লাল রক্তের স্রোত। রোটরের ধাক্কা খেয়ে কোথায় ছিটকে পড়েছে মাথাটা আল্লাই মালুম। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, নিজের রোটরে মুণ্ডুহীন হলো পাইলট। তবে বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘরের ভেতরই ঘটে, পাইলটের ঘর বলতে তো হেলিকপ্টারকেই বোঝায়। রানা কাঁপছে, ভাইব্রেশনই একমাত্র কারণ নয়। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। পাইলটের সীটে বসে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাল।

সিকোরস্কির কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে অনেক মিল আছে। বেশিরভাগ ডায়াল আর লিভার চিনতে পারল রানা। অলটিচ্যুড রীডিংগুলো মিটারে লেখা রয়েছে। কিন্তু দুটো সুইচ আর একটা লিভার সম্পূর্ণ অপরিচিত লাগল। পাইলট যে লিভারে হাত দিয়েছিল সেটা ধরল রানা। কিছুই ঘটল না। আরও একটা চাপ দিল। সাথে সাথে বরফ থেকে শূন্যে উঠে পড়ল সাবমেরিন

কিলার। লিভারটা নিজের দিকে টানল ও। ঝাঁকি খেলো হেলিকপ্টার, আবার নামল বরফে। হুক থেকে স্পেয়ার হেলমেটটা নামিয়ে দ্রুত হাতে পরে নিল। একটু ঢিলে হলো হেলমেট। ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের আলো মাঝে মধ্যে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ, কেমন যেন ঝাপসা লাগছে সব কিছু। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। অনিদ্রা আর ক্লান্তি। বিশ্রাম না পাওয়ায় গোলমাল করছে চোখ দুটো।

কন্ট্রোল প্যানেলে হাত দিল রানা। অলসভঙ্গিতে কয়েকটা সুইচ অন করল, সামনে ঠেলল কয়েকটা লিভার। মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি, যে-কোন মুহূর্তে রাশিয়ানরা ওদের স্লেজ-টীমের কাছে পৌঁছে যাবে। থ্রটল খুলে দিল রানা। জোড়া এঞ্জিন গর্জে উঠল। বড় করে শ্বাস নিল ও, তারপর ঠেলে দিল ওপরে ওঠার লিভারটা।

পাঁচ

সগর্জনে, খাড়াভাবে ওপরে উঠল সাবমেরিন কিলার। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, মেশিনটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এত দ্রুত উঠবে ভাবতে পারেনি। অলটিমিটারে একশো মিটার রীডিং দেখে শূন্যে থামাল হেলিকপ্টার। তারপর সামনে খানিকদূর এগিয়ে দিক বদল করল। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে দূরে তাকাল, আইসব্রেকার কিউটকে বিস্তীর্ণ বরফের মাঝখানে খেলনার মত লাগছে দেখতে। দিক বদল সম্পূর্ণ হবার আগেই সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। ছোট্ট একটা লিভার, অচেনা, স্পর্শ করা

মাত্র তীব্র ঝাঁকি খেলো হেলিকপ্টার। রানা অনুভব করল, প্যানেলের পিছনে ভয়ঙ্কর শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, লিভারটা ছুঁতে যা দেরি, অমনি তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দেবে।

প্রেশার রিজের অনেক ওপরে রয়েছে রানা, একটা করিডরে দু'জন লোককে দেখতে পেল। সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে স্লেজ-টীমের খোঁজে আরও সামনে তাকাল ও। নিয়াজকে নির্দেশ দিয়ে এসেছে, পিছিয়ে গিয়ে নিরাপদ একটা জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে থাকবে ওরা। শুধু ওখানেই ল্যান্ড করতে পারবে হেলিকপ্টার। প্রেশার রিজের গোলকধাঁধার মাঝখানে সমতল বরফের খুদে একটা প্ল্যাটফর্ম।

আরও কয়েকজন রাশিয়ানকে দেখল রানা। উড়ে এল তাদের মাথার ওপর দিয়ে। মুখ তুলে তাকাল তারা। আরও খানিকদূর এগিয়ে এসে ভুলটা ধরতে পারল ও। প্ল্যাটফর্ম ফেলে এসেছে পিছনে। দিক বদলে আবার ফিরে চলল সাবমেরিন কিলার।

ভয় ভয় করছে। প্ল্যাটফর্মে রাশিয়ানদের চেয়ে আগে পৌঁছুতে হবে ওকে। নাকি এরই মধ্যে রাশিয়ানদের একটা দল পৌঁছে গেছে সেখানে? ফার মোড়া আরও কয়েকজন লোককে দেখা গেল। ছুটছে তারা, মুখ তুলে ওপরে তাকাল। মনে হলো, নালাগুলোর ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছে লোকগুলো। সবাই একই দিকে ছুটছে না।

ছায়ার ভেতর সাদা বৃত্তটা অবশেষে চোখে পড়ল। প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে মূর্তি, একজোড়া স্লেজ-টীম, এক পাল কুকুর। একটা মূর্তি ঘন ঘন হাত নাড়ছে।

প্ল্যাটফর্মের চারদিকে বরফের ঢাল, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে

গেছে। সেই ঢালের মাথায় আচমকা পাঁচজন রাশিয়ানকে দেখা গেল। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, তাকিয়ে আছে নিচের প্ল্যাটফর্মের দিকে।

মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। অনেক দেরি করে পৌঁচেছে ও।

নিচে নামছে হেলিকপ্টার। প্রায় খাড়াভাবে। তারপর হঠাৎ রাশিয়ানদের দিকে ছুটল। বিস্ময়ে স্তম্ভিত, নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল লোকগুলো। কি ভাবছে ওরা কে জানে। পাইলটকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু হেলমেট আর গগলস পরে থাকায় চেনার উপায় নেই। তবে মেশিনটা নিজেদের। পাইলটের কি মাথা খারাপ হলো? সরাসরি এভাবে ছুটে আসার মানে কি?

আরও নিচে নামল রানা। স্কিডগুলো ঢালের মাথা প্রায় ছুঁয়ে যাবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রাণ বাঁচানো ফরজ মনে করল লোকগুলো। রানাও স্বস্তিবোধ করল। প্রয়োজন ছাড়া, একান্ত বাধ্য না হলে কাউকে মেরে ফেলার ইচ্ছে নেই। পাইলটের উদ্দেশ্য ভাল নয় বুঝতে পেরে ঝেড়ে দৌড় দিল লোকগুলো।

আবার ওপরে উঠল রানা, ঘুরল। পাঁচজনের দলটা চওড়া একটা করিডর ধরে ছুটছে। ডাইভ দিল সাবমেরিন কিলার, করিডরের ওপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে ছুটল। হেলিকপ্টার ধাওয়া করছে বুঝতে পেরে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল লোকগুলো, যে যেদিকে পারে বাঁক নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। ওদেরকে পিছনে ফেলে এসে ঘাড় ফেরাল রানা। প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে ছুটছে সবাই। পালিয়ে বাঁচছে।

একটা কথা ভেবে মজাই লাগল রানার। গুলি করা তো দূরের

কথা, কেউ ওর দিকে রাইফেল পর্যন্ত তোলেনি। নিজেদের সম্পদ, কার না দরদ থাকে। লোকগুলোকে আরও দু'বার ধাওয়া করল ও। বরফ মোড়া খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে অনেক দূর চলে গেল গোটা দল। এরপর প্ল্যাটফর্মে নামল হেলিকপ্টার।

তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে বরফে আছাড় খেলো রানা। সময়ের ব্যাপার মাত্র, একজোট হয়ে আবার ফিরে আসবে রাশিয়ানরা। 'কুকুরগুলোকে আগে তোলো,' ছুটে আসছিল বিনয়, নির্দেশ দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'সাবধান, রোটরের কথা ভুলে যেয়ো না।' কুকুরগুলোর বাঁধন আগেই খুলে দেয়া হয়েছে, ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে ওগুলোকে হেলিকপ্টারে তোলা হলো। একটু দূরে সরে গেছে রানা, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকের ঢালের মাথায় লক্ষ রাখছে। রাইফেলটা দু'হাতে ধরা। স্লেজ দুটো তোলার পর দরজা থেকে হাঁক ছাড়ল নিয়াজ, 'আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু পাইলট না থাকায় আমরা অচল।'

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে কপ্টারের দিকে ছুটল রানা।

সোজা এক হাজার ফিট উঠে এল রানা, রাইফেল রেঞ্জের বাইরে। ট্র্যান্সপারেন্ট, গম্বুজ আকৃতির কন্ট্রোল কেবিনের কাছাকাছি হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে নিয়াজ, কুকুরগুলোর মাঝখানে। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে বিনয়। ইভেনকো রুস্তভ সবার পিছনে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে শিরদাঁড়া খাড়া করে।

'এবার আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দিন,' গম্ভীর সুরে বলল সে। 'কিউটে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি, টিউবটা এখন থেকে আমার কাছে থাকবে।'

'আপনার জিনিস মানে?' রানা নয়, জবাব দিল নিয়াজ। 'আপনি নিজেও তো এখন আর আপনার নন। আপনি তো বিক্রি হয়ে গেছেন। ভুলে যাবেন না, আমেরিকানদের সাথে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছে। মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম বা আপনি, আমাদের কাছে পণ্য ছাড়া কিছু নয়। এই দুটো জিনিস আমেরিকানদের হাতে তুলে দিতে পারলে ওরা আমাদেরকে এক বিলিয়ন ডলার ফি দেবে। কাজেই মাইক্রোফিল্মটা আমাদের কাছে আছে, থাকবেও।'

ইভেনকো রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিল রানা, 'আর মেরিলিন চার্টের যে মাইক্রোফিল্ম আপনি নিয়ে এসেছেন সেটা যদি নকল বা অসম্পূর্ণ হয়, আমেরিকানরা শুধু যে আপনাকে কান ধরে ওঠ-বোস করাবে তাই নয়, আমাদের ফি-ও অর্ধেক কমিয়ে দেবে।' রানা আর নিয়াজ, দু'জনেই বাড়িয়ে বলছে। অভিযান সফল হোক বা না হোক, ওদের ফি ওরা পাবেই।

প্রচণ্ড রাগে বিস্ফোরিত হবার কথা, কিন্তু না—সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে ইভেনকো রুস্তভ ক্ষীণ হাসল। 'কি বললেন? নকল মাইক্রোফিল্ম নিয়ে এসেছি? হাহ্-হা! তাহলে শুনুন বলি কি ঘটেছিল। লেনিনগ্রাদ থেকে চার্টের দুটো মাইক্রোফিল্ম নিয়ে আসি আমি। একটা রাখি এন.পি. সেভেনটিনে আমার ঘরে, অপরটা থাকে টেপ দিয়ে আমার ঊরুর সাথে আটকানো। এন.পি. সেভেনটিনে এক লোককে আমি কে.জি.বি-র এজেন্ট বলে সন্দেহ করতাম। জানতাম, আমি না থাকলে মাঝে মধ্যে আমার ঘরে ঢুকে তল্লাশি চালায়। একদিন টের পেলাম, ঘরে রাখা মাইক্রোফিল্মটা কেউ নাড়াচাড়া করেছে। ভাল করে পরীক্ষা করে আমার সন্দেহ

হলো, ওটা আমার রাখা জিনিসই নয়। সম্ভবত আমারটার বদলে নকল একটা চার্টের মাইক্রোফিল্ম রেখে গেছে। কে.জি.বি-র এজেন্ট হঠাৎ করে ফিনল্যান্ডে চলে যাওয়ায় আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো।'

নিয়াজ জিজ্ঞেস করল, 'চার্টটা আপনার তৈরি, অথচ আসল না নকল চিনতে পারেন না?'

'কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে নকলগুলো এমনভাবে তৈরি করেছে, চিনতে পারা সত্যি কঠিন।'

'তারপর? নকল চার্টের মাইক্রোফিল্মটা কি করলেন?' জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

'নষ্ট করে ফেললাম,' সাথে সাথে জবাব দিল ইভেনকো। 'কাজেই, যা বলছিলাম, আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন, আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্মই নিয়ে এসেছি আমি।'

কিউটের দিকে রওনা হবার আগে রুশ সিকিউরিটি এজেন্টদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে দখল করা সাবমেরিন কিলার। তবে ইভেনকো রুস্তভের কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে রানা। কে.জি.বি. আর স্পেশাল সিকিউরিটির মধ্যে সম্পর্ক ভাল নয়, জানা আছে ওর। ইভেনকোর ওপর নজর রাখার জন্যে কে.জি.বি. লোক পাঠিয়েছিল, লোকটা ইভেনকোর ঘরে ঢুকে আসল চার্টের জায়গায় নকল চার্ট রেখে ফিরে গেছে ফিনল্যান্ডে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। ইভেনকোর কাছে আসল চার্ট আরও একটা ছিল। সেটাই নিয়ে এসেছে সে।

ইভেনকোকে আমেরিকায় নিয়ে আসার জন্যে কে.জি.বি. এজেন্ট জন মিলার রানাকে অনুরোধ করেছিল। কে.জি.বি.

ইভেনকোকে নকল চার্ট গছিয়ে দেয়ার চেষ্টাও করেছে। রানা স্বভাবতই ধরে নিয়েছিল, ইভেনকো রওনা হলে রাশিয়ানরা বাধা দেয়ার ভান করবে, সত্যিসত্যি বাধা দেবে না। কিন্তু ঘটছে ঠিক উল্টোটা। কেন? রহস্যটা কোথায়?

তবে কি কে.জি.বি. স্পেশাল সিকিউরিটিকে তাদের প্ল্যানের কথা জানায়নি? বা জানাবার সুযোগ পায়নি? রহস্যের চাবি সম্ভবত ফিনল্যান্ডে রয়েছে। কিংবা জন মিলার বলতে পারবে কেন কিভাবে কি ঘটল।

নতুন একটা দায়িত্ব অনুভব করল রানা। আসল মেরিলিন চার্ট আমেরিকানদের হাতে পড়লে রাশিয়ানদের যে শুধু মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে তাই নয়, দুই পরাশক্তির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যও নষ্ট হবে। এ-ধরনের একটা চার্ট আমেরিকানদেরও আছে, সেটা যদি রাশিয়ানদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ থাকত তাহলে চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু সে সুযোগ যখন নেই, মেরিলিন চার্ট আমেরিকানরা পেতে পারে না।

'ঠিক আছে,' হঠাৎ আবার মুখ খুলল ইভেনকো, 'মাইক্রোফিল্মটা আপনাদের কাছেই থাকুক। কিন্তু দয়া করে টিউবটা আমাকে ফেরত দিন। ওতে মূল্যবান কোর রয়েছে...'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। নিয়াজের সাথে চোখাচোখি হলো। মাইক্রোফিল্ম নয়, টিউবটা ফেরত চাইছে ইভেনকো!

'বাক্স থেকে বের করতে হবে,' বলল নিয়াজ। 'কিউটে পৌঁছে নিই, আপনার টিউব আপনি পেয়ে যাবেন।'

জবাব শুনে ভারি সন্তুষ্ট দেখাল ইভেনকোকে। নিয়াজের চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটে উঠল, কিন্তু তার আর রানার

মনে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, কিছু একটা গোপন করছে ইভেনকো।

এক হাজার ফিট ওপর থেকে ভৌতিক জাহাজ বলে মনে হলো কিউটকে। কিংবদন্তীর সেই পরিত্যক্ত জাহাজের মত, কোন নাবিক ছাড়াই মহাসাগরে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিউট অবশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে না, নিরেট বরফে আটকা পড়ে আছে। আরও কাছে পৌঁছে রানা দেখল, জাহাজের পিছনে সাগরের গাঢ় খানিকটা পানি টলটল করছে, ওই পথেই পোলার প্যাক ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে কিউট। কিন্তু টলটলে পানির সামনে আবার নিরেট বরফের বিস্তার দেখা গেল। বরফ ভেঙে ভেতরে ঢোকার পর আইসফিল্ড জাহাজের পিছনে আবার জোড়া লেগে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে পিছু হটার পথ।

হঠাৎই কথাটা মনে করিয়ে দিল নিয়াজ, 'দ্বিতীয় সাবমেরিন কিলার এখনও জাহাজের ওপর ঝুলছে।'

'জানি,' বলল রানা। 'ওটাকে ভাগাতে হবে।'

স্টিক টানল রানা, জাহাজের দিকে খানিকটা নামল হেলিকপ্টার। জাহাজের ডেক দেখা গেল, আরেকটা রুশ কপ্টারকে আসতে দেখে ক্রুরা ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। দু'একজন নাবিকের হাতে রাইফেলও দেখা গেল। উঁচু ব্রিজের সামনের দিকে, জাহাজের প্রায় পিছনের অংশে, লণ্ডিং প্যাডে বসে রয়েছে মার্কিন হেলিকপ্টার, একটা সিকোরস্কি। সিকোরস্কির ঠিক মাথার ওপর শূন্যে ঝুলছে রুশ সাবমেরিন কিলার। যতক্ষণ ওখানে থাকবে ওটা, প্যাড থেকে উঠতে পারবে না সিকোরস্কি। উঠতে গেলেই একটার সাথে আরেকটার ধাক্কা লাগবে। কুকুরগুলোর

গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বিনয় মন্তব্য করল, 'দ্বিতীয় সাব-কিলারের পাইলট ভাবছে আমরা তার বন্ধু আসছি।'

'বাঁশ নিয়ে!' বলল নিয়াজ।

'ওরা কিন্তু আমাদের ক্র্যাশ করাবার চেষ্টা করতে পারে...,' ফোল্ডিং চেয়ার থেকে আঁতকে উঠল ইভেনকো। যেন হঠাৎ করে বিপদটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিচলিত হয়ে পড়েছে। ভাল করে দেখার জন্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, আহত গোড়ালির ওপর থেকে চাপ কমাবার জন্যে ভর দিল একটা রেইলে।

'আপনি বসুন, ইভেনকো!' ধমকের সুরে বলল রানা। 'বিনয় কি বলল শুনতে পাননি? পাইলট ভাবছে আমরা রাশিয়ান। আপনাকে দেখতে পেলে...'

'খুব সাবধানে, রানা,' সতর্ক করে দিল নিয়াজ। 'দু'জোড়া রোটর কাছাকাছি ঘুরবে। বাতাসের ঘূর্ণি পরস্পরকে কাছে টানতে পারে।'

'ঝুঁকি না নিয়ে উপায় আছে, বলো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ল্যান্ড করার আগে ওটাকে ওখান থেকে সরাতে হবে।' প্রায় জাহাজের ওপর পৌঁছে গেছে ওরা। ধীরগতিতে এগোচ্ছে সাবমেরিন কিলার, ডেক থেকে পাঁচশো ফিট ওপরে রয়েছে। চারশো ফিট ওপরে স্থির হয়ে রয়েছে দ্বিতীয়টা।

বরফ মোড়া রেইলের পাশে সার সার দাঁড়িয়ে রয়েছে নাবিকরা, মুখ তুলে আগন্তুক সাবমেরিন কিলারকে দেখছে। কি না কি ঘটবে ভেবে সবাই উদ্বিগ্ন। কন্ট্রোল কেবিনের কাঁচ মোড়া ছাদ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সরাসরি নিচে তাকিয়ে আছে নিয়াজ, দ্বিতীয় হেলিকপ্টারের রোটর ঘুরতে দেখছে। হিম বাতাসে তুমুল

আলোড়ন তুলে ঘুরছে রোটরের পাতগুলো। 'রানা,' যান্ত্রিক গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল তার চিৎকার। 'আস্তে-ধীরে গাড়লটার পাশে নামতে পারবে?'

'পারব। কেন?'

ভাঁজ করা টুল-কিট পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল নিয়াজ, ভেতর থেকে বের করল বড়সড় ইস্পাতের মাঙ্কি রেঞ্চ। 'এটা দিয়ে শালার গম্বুজে একটা খোঁচা মারব।'

'যা করে আল্লা,' উৎসাহ দেখাল রানা। 'চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু জানালা খুলতে হবে। সাবধান, নিউটনের থিওরিটা প্রমাণ করতে যেয়ো না।'

'আমি রেডি,' বলল নিয়াজ। 'ওটার খুব কাছে নেমো না।' একজোড়া কুকুরকে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। শক্ত হাতে মাঙ্কি রেঞ্চ ধরে জানালা খুলে ফেলল। গরম কেবিনের ভেতর ঢুকে পড়ে চোখে মুখে ছ্যাঁকা দিল ঠাণ্ডা বাতাস, কপ্টার নিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে রানা। হুডটা মাথার পিছনে সরিয়ে দিতেই নিয়াজের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল বাতাসে উড়তে শুরু করল। জানালার বাইরে ঝুঁকে পড়ল সে। কেবিনের ভেতর কথা নেই কারও মুখে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষার মুহূর্তগুলো কেটে যাচ্ছে। ফোল্ডিং সীটের কিনারায় ঝুলে রয়েছে ইভেনকো। প্রায় অচেনা একটা মেশিন, নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিল রানা। সমগ্র অস্তিত্ব টান টান হয়ে আছে ওর। বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে ও, এক চুল এদিক ওদিক হয়ে গেলে সবাইকে নিয়ে পটল তুলতে হবে।

নামছে তো নামছেই, এই নামার যেন শেষ নেই। জানালা দিয়ে নিয়াজ দেখতে পেল, কিউটের ডেক উঠে আসছে ওপরে।

সার সার কালো মাথা পিছন দিকে কাত হয়ে রয়েছে। ব্রিজের জানালা থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ পরা একটা মাথা, সম্ভবত ক্যাপটেন, মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল নিয়াজ, আবার তাকাল রোটরের দিকে। দ্বিতীয় সাব-কিলারের রোটরও উঠে আসছে ওর দিকে।

প্রতিটি মুহূর্ত মাপজোকের মধ্যে রয়েছে রানা। দ্বিতীয় সাব-কিলারের যতটা সম্ভব কাছে নামতে হবে, অথচ রোটরের সাথে রোটরের ধাক্কা লাগা চলবে না। মাঝখানে ফাঁকটা থাকবে নেহাতই নগণ্য, তা না হলে মাঙ্কি রেঞ্চ নাগাল পাবে না গম্বুজের।

হিম বাতাস নিয়াজের চোখে-মুখে যেন বিষ ঢেলে দিচ্ছে, এরইমধ্যে অসাড় হয়ে গেছে পেশী আর চামড়া। সীসার মত ভারী লাগল চোখের পাতা, আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসছে। জানালার ফ্রেম ধরে আরও একটু বাইরের দিকে ঝুঁকল সে। নিঃশব্দে চিৎকার করছে বিনয়, আর নয়, আর নয়! নিচে গম্বুজ, তার ভেতরে হেলমেট পরা পাইলটের ঝাপসা মূর্তি দেখতে পেল নিয়াজ। গম্বুজের কিনারায় বরফ জমেছে। হেলমেট নড়ে উঠল, ম্লান মুখ তুলে ওপরে তাকাল রুশ পাইলট। লোকটার মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারল নিয়াজ। বন্ধু বেশে শত্রু, এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে পাইলট। তা না হলে এভাবে ঠিক গায়ের ওপর নেমে আসছে কেন! জায়গা ছেড়ে সরে যাবার কোন নোটিশ পর্যন্ত দেয়নি। এখন আর নড়াচড়ার সময় নেই।

পরিস্থিতি এখন ঠিক উল্টো। রুশ পাইলট এতক্ষণ অচল করে রেখেছিল আমেরিকান হেলিকপ্টারটাকে, প্যাড থেকে উঠতে দেয়নি। কিন্তু এখন সে নিজেই ফাটা বাঁশে আটকা পড়েছে। না

পারছে নিচে নামতে, না পারছে ওপরে উঠতে। ওপর থেকে একটু একটু করে এখনও নামছে বেদখল সাব-কিলার।

রানা ভেবেছিল ধীরে ধীরে ওদেরকে নামতে দেখলে পাইলটের স্নায়ুর ওপর চাপ পড়বে, সময় থাকতে ভয়ে পালিয়ে যাবে সে। মাঝখানের ব্যবধান যখন পঞ্চাশ ফিট ছিল, ইচ্ছে করলে সরে যেতে পারত লোকটা। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়ে রুশ পাইলটের স্নায়ু ভাঙেনি, অসাড় হয়ে গেছে। কি করলে ভাল হবে বুঝতে না পেরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল সে, কিছুই করল না। হেলিকপ্টার নিয়ে নামতে থাকল রানা, দূরত্ব কমতে থাকল। ওর মেশিনের স্কিডগুলো রুশ পাইলটের মাথার ওপর ঝুলছে। স্কিডগুলো ট্র্যান্সপারেন্ট গম্বুজ থেকে মাত্র কয়েক ফিট ওপরে।

বাতাসে এখন তুমুল আলোড়ন। মাঝে মাঝে হ্যাঁচকা টান অনুভব করছে নিয়াজ, জানালার ফ্রেম থেকে হাত ফসকালেই ঝপ্ করে নিচের রোটরের গায়ে পড়বে। স্রেফ কুচিকুচি হয়ে যাবে গোটা শরীর। ভয় পেয়ে কেবিনের ভেতর ফিরে এল সে, বন্ধ করে দিল জানালা। বাতাসের ঘূর্ণি এখন আরও একটা সমস্যার সৃষ্টি করল। কপ্টার এদিক ওদিক দোল খাচ্ছে। বাতাসের টানে দুটো কপ্টার পরস্পরের দিকে এগোলে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই।

হঠাৎ করেই কপ্টার দুটোকে পাশাপাশি দেখা গেল। আবার জানালা খুলল নিয়াজ।

শুধু পাইলট নয়, পাশে একজন অবজারভারও রয়েছে। হেডসেট অপারেট করছে লোকটা, ওদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে, সেই সাথে অনবরত খই ফুটছে মুখে। কোথাও

সিগন্যাল পাঠাচ্ছে সে। ঠিক এই সময় ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করতে গেল ইভেনকো রুস্তভ।

'বসুন!' গর্জে উঠল রানা। রুশ পাইলট আত্মহত্যার ঝুঁকি নেবে কিনা জানা নেই, কিন্তু ইভেনকোকে দেখতে পেলে কি করে বসে বলা কঠিন। হয়তো নির্দেশ দেয়া আছে, ইভেনকোকে দেখামাত্র প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাকে খুন করতে হবে।

দুটো কপ্টার পাশাপাশি স্থির হয়ে আছে। রানা সামনের দিকে ছুটে যাবার জন্যে তৈরি, ওর সমস্ত মনোযোগ সামনে মাথাচাড়া দিয়ে থাকা মাস্তুলের দিকে। যাই ঘটুক, ওটাকে এড়িয়ে যেতে হবে। 'গো অ্যাহেড, নিয়াজ,' চিৎকার করল ও। 'কাজটা শেষ করো।'

হঠাৎ করেই ওদের নিচে পরিষ্কার হয়ে গেল কিউটের ডেক। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিতেই হোক, বা কমান্ডারের নির্দেশেই হোক, হঠাৎ আমেরিকান নাবিকরা দৌড় দিল। চোখের নিমেষে আড়ালে গা ঢাকা দিল তারা। নিয়াজের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, হাত রয়েছে লিভারে–ঠেলে দিলেই সামনের দিকে ছুটবে হেলিকপ্টার। কেবিনের ভেতর যান্ত্রিক আওয়াজ অসহ্য হয়ে উঠেছে। শুধু ওদেরটা নয়, পাশের কপ্টারও বিপজ্জনকভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে।

আরও ভাল করে দেখার জন্যে চোখ কুঁচকে তাকাল নিয়াজ। পাশের কপ্টারের গম্বুজ মাত্র কয়েক গজ দূরে। রেঞ্চ যাতে নাগাল পায়, জানালার ফ্রেম ধরে আরও খানিকটা বাইরে ঝুলে পড়ল সে। ডান হাতে রয়েছে রেঞ্চ। হাতটা লম্বা করে দিল মাথার ওপর। তারপর বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে গম্বুজ লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল

প্রাণপণ শক্তিতে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে রেঞ্চটা ছুঁড়ে দিল নিয়াজ। মনে হলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, গম্বুজের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

কাঁচ, কিন্তু এ-কাঁচ ভাঙে না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, গম্বুজেই আঘাত করেছে রেঞ্চ, কিন্তু ভাঙল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল নিয়াজ। কাজ হয়েছে। প্রচণ্ড আঘাতে শত সহস্র চিড় ধরেছে কাঁচের গায়ে। গম্বুজ এখন আর ট্র্যান্সপারেন্ট নয়, দুধের মত সাদাটে হয়ে গেছে–সম্পূর্ণ ঝাপসা। পাইলট আর অবজারভারকে এখন অন্ধই বলা চলে, চোখ থাকতেও। গম্বুজের বাইরে কিছুই তারা দেখতে পাচ্ছে না। লিভার ঠেলে দিল রানা, অকস্মাৎ গতি পেয়ে সামনের দিকে ছুটল হেলিকপ্টার। খাড়া পাইপের মত মাস্তুলটাকে পাশ কাটিয়ে এল। নিচে এখন বরফের আদিগন্ত বিস্তার।

প্রতিটি হেলিকপ্টারের পিছনে একটা ছোট রোটর থাকে, টেইল রোটর ছাড়া কোন হেলিকপ্টার উড়তে পারে না। রুশ পাইলট তার টেইল রোটরের কথা কয়েক সেকেন্ড ভুলে ছিল, আর সেটাই তার মৃত্যুর কারণ হলো।

রানাও ধারণা করেছিল, রুশ পাইলট ভুল করবে। ভুল করা স্বাভাবিক। চারদিকের সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, আচমকা ঝাপসা হয়ে গেল সব। দৃশ্যমান জগৎ বলতে কেবিনের ভেতরটা, বাকি সব দৃষ্টিসীমার বাইরে। পাইলট আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

মাস্তুলকে এড়িয়ে জাহাজের ওপর থেকে সরে যেতে হবে তাকে, ফিরে যেতে হবে বরফের ওপর। লিভার ঠেলল সে, কাঁপা

হাতে। দিক হারিয়ে ফেলেছে, মাস্তুলটা ঠিক কোথায় জানে না। তবু আন্দাজের ওপর নির্ভর করে জাহাজের ওপর থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল সে। চিড় ধরা গম্বুজের ভেতর থেকে মাস্তুলটাকে দেখতে পেল সে, আবছা, একেবারে শেষ মুহূর্তে। দক্ষ পাইলট, রোটরের সাথে মাস্তুলের ধাক্কা লাগতে লাগতেও লাগল না। মাস্তুলটাকে পাশ কাটিয়ে এসে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল সে, ভুলটা হলো সেখানেই। টেইল রোটরের কথা মনে থাকলে এত তীক্ষ্ণ বাঁক নিত না। টেইল রোটর চুমো খেলো মাস্তুলটাকে, সাথে সাথে গোটা মেকানিজম খসে পড়ল হেলিকপ্টার থেকে।

তাল হারিয়ে লাট্টুর মত ঘুরতে লাগল সাবমেরিন কিলার। কেবিনের ভেতর সেই সাথে ঘুরছে পাইলট আর অবজারভার। শুধু ঘুরছে যে তাই নয়, প্রতি মুহূর্তে ঘোরার গতি বাড়তে লাগল। ভাল চক্করে পড়েছে দু'জন, স্ট্র্যাপ দিয়ে সীটের সাথে আটকানো শরীরের ওপর কারও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই গতিতে ঘোরার মেয়াদ লম্বা হলে যে-কোন মানুষ পাগল হয়ে যাবে। এক অর্থে ওদের ভাগ্য ভালই বলতে হবে, বেশিক্ষণ ঘুরতে হলো না। যে ছন্দে, যে তালে ঘুরছিল সাব-কিলার সেটা অল্পক্ষণ টিকল, তারপরই কাত হয়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িং। গোপ্তা দিয়ে নেমে এল বরফে। সংঘর্ষের সময়ও রোটর ঘুরছিল। কিউট থেকে তিনশো গজ দূরে আছাড় খেলো ফিউজিলাজ। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। কাগজের মত ছিঁড়ে চারদিকে উড়ে গেল রোটরের পাত। বিস্ফোরিত হলো ফুয়েল ট্যাংক। আগুনের শিখা লাল চাদরের মত লকলকিয়ে উঠল। তারপর কালো ধোঁয়া; উত্তুরে বাতাস পেয়ে সাদা বরফের ওপর নাচতে লাগল কোমর দুলিয়ে।

রুশ হেলিকপ্টারের বিনাশ আরও একজন চাক্ষুষ করল। দু'মাইল দূরে, তিন হাজার ফিট ওপর দিয়ে উড়ছে আরেকটা সাব-কিলার। পাইলটের পাশে বসে রয়েছে কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। ধীরে ধীরে চোখ থেকে নাইট-গ্লাসটা নামাল সে। নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে পাইলট।

'কি ঘটল?' পিছন থেকে জানতে চাইল জুনায়েভ। 'ওদিকে আগুন কিসের?'

'চোপ!' বাঘের মত গর্জে উঠল কর্নেল। 'আমাকে ভাবতে দাও!'

শোকে কাতর হয়ে পড়েছে কর্নেল। কি ঘটছে দেখার জন্যে মাত্র এক ঘণ্টা আগে কিউটের দিকে রওনা দিয়েছিল সে। আসার পথে একটা মেসেজ পায়, তাতে বলা হয়—মাসুদ রানার টীমকে খুঁজে বের করা হয়েছে, সিকিউরিটি ডিটাচমেন্টের লোকেরা ল্যান্ড করেছে বরফে, মাসুদ রানা যাতে কিউটে পৌঁছুতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেসেজ পেয়ে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেছিল সে।

কিউটের কাছাকাছি পৌঁছে কর্নেল দেখে, জাহাজের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের একটা সাব-কিলার। রেডিও-টেলিফোনে পাইলটকে নির্দেশ দেয় সে, নট নড়নচড়ন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো ওখানে। তারপরই দ্বিতীয় সাব-কিলার এল। কি ঘটছে কিছুই বুঝল না কর্নেল। রুশ পাইলট রিপোর্ট পাঠাতে শুরু করল। প্রথম দিকে চুপচাপ শুনে গেল সে, বাধা দিল না। 'ওটা আমাদেরই সাব-কিলার, অথচ হুমকির মত মাথার ওপর নেমে

আসছে…ভেতরে কয়েকজন মানুষ…জানালা খুলে রেখেছে…ইভেনকো, ইভেনকো! পরিষ্কার দেখলাম…অনেক কুকুর…তিনজন লোক, চিনি না…।' এরপর মেসেজ পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। কারণটা কি জানার জন্যে চোখে নাইট-গ্লাস তুলেছিল কর্নেল। পরিষ্কার না হলেও, হেলিকপ্টারটাকে বিধ্বস্ত হতে দেখেছে সে।

তার পিছন থেকে জুনায়েভ লক্ষ করল, কর্নেলের কাঁধ শক্ত হয়ে গেল। ঝট্ করে ঘুরল কর্নেল, ভয় পেয়ে একদিকে কাত হয়ে গেল জুনায়েভ। 'রিসার্চ শিপ রিগায় সিগন্যাল পাঠাও। বলো আমি আসছি। ফুল পাওয়ার দিয়ে রেডিও-জ্যামিং শুরু করতে বলো। সমস্ত জাহাজ তাই করবে। রিগা হবে আমাদের হেডকোয়ার্টার। কিউটই আমাদের কাছে আসবে।'

'টেকনিকালার…পেলিকান, টেকনিকালার…পেলিকান…'

কিউটের ক্যাপটেনের মাধ্যমে মাঝরাতে রানার দুটো মেসেজ পেলেন জেনারেল ফচ। প্রথম মেসেজটা পেয়ে উল্লাসে অধীর হলেন তিনি, মুখের ভেতর রসুনের যে কোয়াটা ছিল আরেকটু হলে গলায় আটকে যাচ্ছিল। ঢোক গিলে সেটাকে পেটে চালান করে দিয়ে টমাসকে বললেন, 'ইভেনকো এখন আমাদের হাতে, টীম নিয়ে রানা কিউটে পৌঁছে গেছে!' অপারেটরকে বললেন, 'ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলব, লাইন লাগাও।' আইসক্যাপে রয়েছে রিমোট ডিসট্যান্ট আর্লি ওয়ার্নিং স্টেশন, তার সাহায্যে হট লাইন জ্যান্ত হয়ে উঠল। ওয়াশিংটন, ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের সাথে এক মিনিট কথা বললেন জেনারেল ফচ। তিনি চান, কিউটকে

বন্দরে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটা শিপের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। তারা বলল, 'ইভেনকোকে নিয়ে রানা যখন কিউটে উঠতে পেরেছে, এরপর আর কিছু ঘটতে পারে না। রাশিয়ানদের এত সাহস নেই যে মার্কিন জাহাজের গায়ে টোকা দেবে।'

হট লাইন অফ হয়ে যেতে পায়চারি শুরু করলেন জেনারেল ফচ। বারবার মুখ তুলে ওয়াল-ম্যাপের দিকে তাকালেন। আই.আই. ফাইভের আশপাশে যতগুলো জাহাজ রয়েছে সবগুলোর পজিশন লক্ষ করছেন।

নিস্তব্ধতা ভাঙল টমাস। 'আপনি যে সিগার ধরালেন, স্যার, তারমানে কি রানার মেসেজ পেয়ে সেলিব্রেট করছেন...?'

'তুমি একটা ইমপসিবল ক্যারেক্টার হয়ে উঠছ,' খেঁকিয়ে উঠলেন জেনারেল।

টমাস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরও পায়চারি থামালেন না। নিজের অজান্তেই বারবার চোখ চলে যাচ্ছে ম্যাপের দিকে। অস্বস্তিবোধ করছেন তিনি, জানেন বিছানায় গিয়েও ঘুমাতে পারবেন না। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের কথা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত। ওদের ধারণা, আর কিছু ঘটতে পারে না। কিন্তু, আসলে, ঘটনা এই তো মাত্র ঘটতে শুরু করেছে। ওয়াশিংটনকে বোঝাবার সাধ্য তার নেই। প্রেসিডেন্ট চীন সফরে রয়েছেন, তাই নিয়ে সবাই ওরা ব্যস্ত।

দ্বিতীয় মেসেজটা কিউটের ক্যাপটেনের মাধ্যমে নয়, সরাসরি রানার কাছ থেকে এল। আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল হট লাইন, এবার সুইটজারল্যান্ড থেকে সোহানা কথা বলল রানার সাথে। হ্যাঁ, রানা

এজেন্সির অ্যাকাউন্টে মার্কিন সরকারের দেয়া এক বিলিয়ন ডলারের চেক জমা হয়েছে। পুরো টাকাটা ইতিমধ্যে ঢাকায় ট্র্যান্সফারও করেছে সোহানা। রানার কয়েকটা নির্দেশ দ্রুত হাতে লিখে নিল সে। ফিনল্যান্ডে নতুন কে.জি.বি. এজেন্ট গেছে, জন মিলারের কাছ থেকে তার পরিচয় জানতে হবে, ইত্যাদি।

হটলাইনে চুমোর শব্দ হলো, দুই প্রান্ত থেকেই, তারপর ক্লিক শব্দের সাথে কেটে গেল যোগাযোগ।

ছয়

ঘুসি তুলে পাইলটকে মারতে গেল কর্নেল বলটু। 'ল্যান্ড করো। বলছি, ল্যান্ড করো! একদিন তো ওটায় নামতে হবে!' গলা নয়, যেন বজ্রপাতের আওয়াজ, হেলিকপ্টারের গর্জন সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল।

ষোলোশো টন রিসার্চ শিপ রিগার ওপর ঝুলে রয়েছে সাবমেরিন কিলার, ঘুসি খাবার ভয় থাকা সত্ত্বেও ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল না পাইলট। বেয়াদপ বাতাসের ধাক্কায় একদিকে কাত হয়ে পড়ল কপ্টার, ছিটকে পড়া থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে সীটের পিঠ আঁকড়ে ধরল কর্নেল। ব্লাডি অ্যামেচার, মনে মনে ইংরেজিতে গাল পাড়ল সে। ফ্লাইং স্কুল থেকে পাইলট হয়ে আজকাল যারা বেরোচ্ছে, বিপদের সময় দেশটাকে নির্ঘাত ডোবাবে। তার পিছনে সীটের ওপর কুঁকড়ে বসে রয়েছে জুনায়েভ। এমনিতেই আকাশে উঠলে বমি পায় বেচারির, তার

ওপর উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়া ওদের নিয়ে তামাশা করছে।

কপ্টারের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল পাইলট, কর্নেলের দিকে না তাকিয়ে সবিনয়ে বলল, 'বসাটাই নিরাপদ, কমরেড কর্নেল...'

'কাপুরুষ! অযোগ্য!' পা ঠুকল কর্নেল, মনে হলো ঝাঁকি খেলো সাব-কিলার। 'নিরাপত্তা সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো? বুদ্ধু কাঁহিকে, এতক্ষণ ধরে কি বলছি?' তেড়ে মারতে গেল আবার। 'নামো জাহাজে!'

'কর্নেল কমরেড,' গোঁ ধরে বসল পাইলট, 'ল্যান্ডিং কন্ডিশন অত্যন্ত বিপজ্জনক। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা আমার দায়িত্ব। যথেষ্ট ফুয়েল আছে, যতক্ষণ খুশি আকাশে থাকতে পারব...'

অবজারভারের সীটে বসল কর্নেল, পাইলটের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একের পর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাল, 'আমি তোমাকে আদেশ করছি, জাহাজে ল্যান্ড করো। আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, বুঝেছ? নামো!'

অসহায় দেখাল পাইলটকে, ভাবটা—হায়, এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম!

মুখ ফিরিয়ে সাগরের দিকে তাকাল কর্নেল। ভীতিকর দৃশ্য, সন্দেহ নেই। বিশাল রিসার্চ শিপের প্রকাণ্ড রাডার চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, ব্রিজের সামনে কিম্ভূত আকারের মসজিদ যেন, জাহাজের সাথে মাতালের মত দুলছে। বিরাট আকৃতির ঢেউ, একের পর এক আসছে, প্রতিটির মাথায় চড়ে নাচছে জাহাজ। যখন কাত হয়ে পড়ে, মনে হয় গম্বুজ আকৃতির রাডার মাস্ট সাগর ছুঁতে চাইছে। আইসফিল্ডের কাছাকাছি বলে, ঢেউ আর স্রোতের সাথে জাহাজের দু'পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে বরফের

চাঁই।

তিনশো ফিট ওপরে রয়েছে কপ্টার। নামতে শুরু করল।

রাডার মেকানিজম লক্ষ্য করে নামছে পাইলট। ওটার ঠিক সামনেই ল্যান্ডিং প্যাড। জাহাজের ডেক যখন কোন দিকে কাত হয়ে নেই, ঠিক সেই সময় প্যাডে ল্যান্ড করতে হবে। তা না হলে প্যাডে নামার সাথে সাথে উল্টে যাবে কপ্টার, ডিগবাজি খেয়ে রেইল ভেঙে পড়বে গিয়ে সাগরে। পানি থেকে হিম বাষ্প উঠছে, ঝাপসা হয়ে গেল উইন্ডস্ক্রীন। গায়ে কর্নেলের দৃষ্টি অনুভব করল সে, গরম আঁচের মত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে নামছে সে। উইন্ডস্ক্রীনের সামনে বিশাল পেন্ডুলামের মত কি যেন ঝুলে রয়েছে। মাস্টহেড, ডগায় রাডার উইং সহ। গোটা মাস্তুলের গায়ে গিজগিজ করছে ইলেকট্রনিক গিয়ার। রুশ কর্মকর্তারা রিগাকে রিসার্চ শিপ বললেও, আসলে ওটা সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা জাহাজ।

কপ্টার আরও নিচে নেমে এল। দৃষ্টিপথের প্রায় পুরোটা জুড়ে থাকল রাডার ডোম, জাহাজের সাথে দুলছে। পাইলট তাকিয়ে আছে আরও সামনে, মাস্টহেডের দিকে। মাস্টহেড কাত হয়ে ছিল, ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে। পুরোপুরি সিধে হলে বুঝতে হবে অদৃশ্য ল্যান্ডিং প্যাড কোন দিকে ঢালু হয়ে নেই। অবস্থাটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে টিকবে, তারপর মাস্টহেড কাত হতে শুরু করবে আরেক দিকে, সেই সাথে কাত হবে প্যাডও। আন্ডারক্যারিজের নিচে ঝুলে থাকা স্কিডগুলো প্যাড স্পর্শ করল। ছুটে এল অপেক্ষারত টেকনিশিয়ানরা। অ্যাংকর রিঙগুলো ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে দেয়া হলো দ্রুত হাতে। রোটর ঘুরছে, দরজা খুলে

ফেলল কর্নেল। কাঁধের ওপর দিয়ে পাইলটের দিকে তাকাল সে। ‘দেখলে তো! চেষ্টা না করলে জানাও যায় না নিজের ক্ষমতা!’ রোটরের তলায় মাথা নিচু করে দাঁড়াল সে, লাফ দিয়ে পড়ল জাহাজের ডেকে। জাহাজ আবার কাত হতে শুরু করেছে, রেইল ধরে হোঁচট খেতে খেতে এগোল। রেইল টপকে থাবা মারল লোনা পানি, দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। পানি সরে যেতে পারকার ভাঁজ থেকে বরফের টুকরো ঝাড়ল। মই বেয়ে ব্রিজে ওঠার সময় ঘোঁৎ করে আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে, যেন বিরূপ প্রকৃতির ওপর ঝাল ঝাড়ল। দরজা খুলে গেল, ভেতরে দেখা গেল ক্যাপটেন লিউনিদ ট্রাভকিনকে।

‘কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ!’ গা থেকে পানি ঝরছে, ভিজে পারকা খুলে মেঝেতে ফেলে নিজের পরিচয় দিল কর্নেল। ‘আপনি ট্রাভকিন? ভাল। নতুন কাপড়, প্লীজ। কচ্ছপের মত একটু একটু করে উত্তরে যাবার মানে কি?’

ক্যাপটেন ট্রাভকিন রোগা-পাতলা, চোখ জোড়া বুদ্ধি-দীপ্ত। জাহাজের ওপর দিয়ে কি রকম ধকল যাচ্ছে ভাল করেই জানে। কোন ব্যাপারেই অস্থির হবার লোক নয় সে। নতুন কাপড়-চোপড় আনার নির্দেশ দিয়ে, কর্নেলকে নিয়ে ব্রিজের পিছনে চার্টরূমে ঢুকল। চার্টের ওপর ঝুঁকে কাজ করছিল এক লোক, তাকে বিদায় করে দিল সে। দরজা বন্ধ করল। তারপর শান্ত গলায় বলল, ‘আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে চাই...’

‘প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা হলো!’

‘কি নিয়ে প্রতিবাদ তাই এখনও বলিনি...!’ বিস্মিত দেখাল ট্রাভকিনকে।

‘শুনতে চাই না!’

‘কিন্তু কমরেড কর্নেল, এদিকের সাগর বিপজ্জনক! এই আকারের জাহাজ নিয়ে…!’

‘নতুন কিছু বলার আছে?’ আবার বাধা দিল কর্নেল। দস্তানা খুলে সাইড টেবিলে রাখল। জ্যাকেটের পকেট থেকে স্টীল-রিম চশমা বের করে পরল, ঝুঁকল চার্ট টেবিলের দিকে। একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে আঁক কাটল চার্টে। ‘শেষবার যখন দেখেছি, এখানে ছিল আমেরিকান আইসব্রেকার কিউট। এই মুহূর্তে বরফ ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ওরা। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে…’ চার্টের গায়ে মোটা একটা রেখা আঁকল সে। ‘আমরা উত্তর দিকে যাব।’ রেখাটা ধরে আবার উঠতে লাগল পেন্সিল। ‘কাজেই নতুন কোর্সে জাহাজ চালান। ফুল স্পীডে।’

ক্যাপ খুলে চার্টের ওপর ফেলল ট্রাভকিন, কর্নেল যাতে আর কোন আঁক কাটতে না পারে। হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে কর্নেলের দিকে তাকাল সে। ‘এই জাহাজ আমার নির্দেশে চলে, কমরেড কর্নেল। জাহাজে আপনাকে জায়গা দেয়ার নির্দেশ আছে আমার ওপর। নির্দেশ আছে আপনাকে সাহায্য করার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনার কথা মত জাহাজ চালাতে হবে আমাকে…’

‘অবোধ, অবাধ্য শিশু!’ কৃত্রিম হতাশায় ম্লান দেখাল কর্নেলকে। ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়ল সে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে পায়ের বুট খুলল। ‘কার স্বার্থ দেখেন আপনি, ক্যাপটেন? নিশ্চয়ই দেশের?’

‘অবশ্যই!’

‘আমাকে দেখে আপনার কি মনে হয়, নিজের স্বার্থ উদ্ধারের

জন্যে আর্কটিকে এসেছি?'

'কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না,' বলল ট্রাভকিন। 'জাহাজ নিয়ে উত্তরে যাবার নির্দেশের বিরুদ্ধে আমি আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রিগা আমাদের অত্যাধুনিক রিসার্চ শিপ। তৈরি করতে কয়েক মিলিয়ন রুবল খরচ হয়েছে। জাহাজের নিরাপত্তার জন্যে আমাকে দায়ী করা হবে। উত্তরে আইসবার্গের ছড়াছড়ি...'

'কিউট গেল কিভাবে? শেষ দিকে তার রাডার পর্যন্ত ছিল না! তোমার মাস্টহেডের মাথায় ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট রয়েছে, ওগুলো ব্যবহার করো।' পায়ে শুধু মোজা, উঠে দাঁড়িয়ে চার্টরূমের এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করতে লাগল। 'রেডিও-জ্যামিং অফিসারের সাথে কথা বলতে চাই। খানিকক্ষণ জ্যামিং বন্ধ রেখে ক্যারিয়ার নার্ভায় জরুরী একটা সিগন্যাল পাঠাতে হবে—সমস্ত হেলিকপ্টারের এখন একটাই কাজ, কিউটের বর্তমান পজিশন জানা। যে পাইলট প্রথম দেখতে পাবে, রিপোর্ট করার জন্যে সোজা এখানে চলে আসবে সে।'

'কেন?' শান্ত প্রকৃতির ক্যাপটেনকে অশান্ত দেখাল। 'এ-ধরনের পাগলামির মানে কি? আপনি যখন আমার কথা শুনবেনই না, আমার প্রতিবাদ এখুনি আমি মস্কোয় জানাব...'

কর্নেলকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল ক্যাপটেন।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল কর্নেল। 'রেডিও অন করার সুযোগ কাউকে আমি দিচ্ছি না। জ্যামিং বন্ধ রাখা হবে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, কারণ হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারে আমার সিগন্যাল পাঠানোটা জরুরী। কিউট দক্ষিণে যাচ্ছে, ওখানে গিজগিজ করছে আইসবার্গ। রাডার নেই, অন্ধের মত হাতড়ে

এগোতে হবে কিউটকে। বাইরের দুনিয়ার সাথে ওদের কোন যোগাযোগ থাকবে না। রেডিও-জ্যামিং বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে ওদেরকে। আমার জন্যে চা আনতে বলুন, ট্রাভকিন। গোটা ব্যাপারটা আসলে কি নিয়ে শুনবেন তারপর।' নাটকীয় ভঙ্গিতে একটু থেমে শেষ কথাটা উচ্চারণ করল সে, 'কি হবে না হবে সে পরে দেখা যাবে, কিন্তু আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। কিউটকে আমরা বাধা দেব। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবে? আমার তা মনে হয় না। ক'জন বাংলাদেশীর জন্যে আমেরিকা অত বড় ঝুঁকি নেবে এ আমি বিশ্বাস করি না।'

নিরেট বরফের সাথে ইস্পাতের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘুম ভেঙে গেল রানার। শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম ভূমিকম্পও বুঝি এরকম ঝাঁকি খাওয়াতে পারবে না, বুঝি বিস্ফোরিত আগ্নেয়গিরিরও সাধ্য নেই এরকম আওয়াজের সাথে পাল্লা দেয়। পোলার প্যাক ভেঙে এগোবার চেষ্টা করছে কিউটের বো। আর একা শুধু রানাই প্রলয়কাণ্ডের সম্পূর্ণ ধাক্কা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ওর কেবিনটা বো-র ঠিক নিচেই। জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায় আরেকটা কেবিন খালি ছিল, নিয়াজ আর বিনয় ঠাঁই নিয়েছে সেখানে। ইভেনকো রুস্তভ অসুস্থ, সিক-বেতে চিকিৎসা চলছে তার।

দুই হাতে চোখ রগড়ে ইস্পাতের দেয়ালের দিকে ভাল করে তাকাল রানা। ধীরে ধীরে ভয়টা কেটে গেল—মোটা পাত ভেঙে বরফের পাহাড় চাপা দেবে ওকে, তা সম্ভব নয়। কিউট আইসব্রেকার, বরফ ভাঙাই তার কাজ। হাতঘড়ি দেখল ও। ভোর চারটে। তারমানে জাহাজে ওঠার পর মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে।

একসাথে একশো বজ্রপাতের সমান আওয়াজ ছিল সেটা, ঘুমটা তাতেই ভেঙেছে। এই মুহূর্তে অমন জোরাল শব্দ নেই, তবে বরফের সাথে ইস্পাতের সংঘর্ষ অবিরাম চলছেই। ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি ফিরে আসছে, এই সময় দরজা খুলে টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল অ্যাকটিং মেট বেন কাফম্যান। তার হাতে এক মগ ধূমায়িত কফি।

'এই আওয়াজের মধ্যে আপনি ঘুমাচ্ছেন দেখে দু'বার আপনার পালস পরীক্ষা করে গেছি,' মৃদু হেসে বলল সে। 'মানুষ এতটা ক্লান্ত হতে পারে, আপনাকে না দেখলে বিশ্বাস হত না।' তাল সামলাবার জন্যে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে, খালি হাতটা বাল্কহেডের কিনারা আঁকড়ে ধরে আছে। 'পরবর্তী ধাক্কা লাগার আগে একটু গিলে ফেলুন।'

'ধন্যবাদ।' মগটা নিয়ে সাবধানে চুমুক দিল রানা, মনে হলো জিভের ছাল তুলে নিয়ে গলা দিয়ে নেমে গেল তরল আগুন। 'আমার বন্ধুদের খবর কি? কমরেড রুস্তভ কেমন আছেন?'

'হয় জেগে আছেন নাহয় মারা গেছেন,' সকৌতুকে বলল কাফম্যান। 'ওঁদের পালস পরীক্ষা করার সুযোগ আমার হয়নি। ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছেন দরজা।' রানা অনুমান করল গোপন একটা কাজে ব্যস্ত রয়েছে নিয়াজ, তাকে সাহায্য করছে বিনয়। 'আর ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জার কমরেড রুস্তভের জ্ঞান নেই।' রানার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখে হাসল সে। 'না-না, ভয়ের কিছু নেই। উনি প্রলাপ বকছিলেন, ঝামেলা এড়াবার জন্যে ক্যাপটেনের নির্দেশে আমাদের ডাক্তার তাঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।'

‘প্রলাপ বকছিলেন মানে?’

‘আমার টিউব, আমার টিউব করছিলেন, কি ছাই বলতে চান বোঝাতে পারছিলেন না…’

‘আমি বুঝেছি,’ বিড়বিড় করে বলল রানা, অ্যাকটিং মেট শুনতে পেল না।

কাফম্যান বেশ লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বয়স হবে চল্লিশের মত। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে কঠোর প্রকৃতির মনে হলেও, ভাল করে তাকালে তার কালো চোখে কৌতুকের ঝিলিক লক্ষ করা যায়। লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখার ফাঁকে আরেকবার মগে চুমুক দিল রানা। আমেরিকান কফি, ভারি কড়া।

দরজার কাছে ফিরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাফম্যান, ঘুরল। ‘সাবধান! ধাক্কা আসছে আবার!’ দরজার ফ্রেম আঁকড়ে ধরল সে। সামনে এগোচ্ছে আইসব্রেকার, এঞ্জিনগুলো প্রচণ্ড শক্তিতে গজরাচ্ছে। কেবিন দেয়ালের সামনেই বো। বো-র ঠিক সামনে কোথাও রয়েছে নিরেট বরফ। কালো পানি কেটে ইস্পাতের বো এগোচ্ছে। শূন্যে, সামনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, মগটা অর্ধেক খালি; অপর হাতটা বাঙ্কের কিনারায়।

ধাক্কা দিল জাহাজ।

প্রবল ঝাঁকিতে মনে হলো ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে যাবে কেবিন। দরজার ফ্রেম থেকে হ্যাঁচকা টান খেয়ে কাফম্যানের হাত ছুটে গেল, কেবিনের ভেতর ছিটকে পড়ল সে। দেয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছিল, কোমর পেঁচিয়ে ধরে তাকে নিজের দিকে টানল রানা। দু’জনেই উপলব্ধি করল, নতুন জীবন পেল অ্যাকটিং মেট। রানার

মনে হলো, বো ভেঙে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে ইস্পাতের পাত, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরিত দেয়াল দিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়বে জ্যান্ত বরফের সচল পাহাড়। যদিও মনে মনে জানে, সে-ধরনের কিছু ঘটতে পারে না। জাহাজ থামল, এঞ্জিনগুলো এখনও আক্রোশে গজরাচ্ছে। উল্টোদিকের বাল্কহেডে ছড়িয়ে পড়েছে কফি, সেদিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ও, 'আমরা কি আদৌ কোথাও যাচ্ছি?'

'এমন গতিতে, যাওয়া বলা হাস্যকর,' দু'হাতে বাল্কহেড জড়িয়ে ধরে হাঁপাচ্ছে কাফম্যান। 'ধন্যবাদ, মি. রানা। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা চাপা দিল রানা।

'প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই কাণ্ড চলছে,' বলল কাফম্যান। 'ঈশ্বর জানেন এই অবস্থায় কিভাবে আপনার ঘুম হলো। পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান? নিরেট বরফের মাঝখানে আটকা পড়েছি আমরা। মুশকিল হলো, আমরা যে শুধু রাডার হারিয়েছি তাই নয়, ওটার সাথে অবজারভেশন কেজটাও হারিয়েছে। খাঁচার ভেতর মেট ছিল, সে-ও মারা গেছে—সেজন্যেই তো আমি অ্যাকটিং মেট। কেন্ রাসেল, বেচারা! আসলে অনেক উঁচুতে একজন লোক থাকা দরকার, ঠিক কোন্ দিক থেকে বরফে ধাক্কা দেয়া উচিত হবে দেখার জন্যে। কিন্তু খাঁচাই নেই, কোথায় লোক পাঠাব!'

কাপড় পরছে রানা। বরফ থেকে পিছিয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে জাহাজ। বুট আর পারকা পরে সিধে হলো ও। আবার কাঁপতে শুরু করল কেবিন। বরফের বজ্র-আঁটুনি থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। টন টন নিরেট বরফ প্রতি মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে

ছড়িয়ে পড়ছে বো-র সামনে। 'ব্রিজে গিয়ে দেখি আমার কিছু করার আছে কিনা,' বলল রানা। কাফম্যানের দিকে সরাসরি তাকাল ও। 'ব্যাপারটা কি আমার কল্পনা? নাকি সত্যি আমাদের আসতে দেখে খুশি হয়নি ক্রুরা?'

কাফম্যানের চেহারা একটু ম্লান হলো। অস্বস্তি বোধ করল সে। 'ও-সব আপনি গ্রাহ্য করবেন না,' গলার সুরে ইতস্তত ভাব। 'আসল কথা, ফেব্রুয়ারিতে এত উত্তরে আসতে চাননি ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যান। গুজব, তাকে নাকি ওয়াশিংটন থেকে নির্দেশ দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে।' হঠাৎ কৌতুকে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার চোখ। 'আপনারা যদি বরফের ওপর মারা যেতেন, আমাদের তাহলে এত ভেতরে ঢুকতে হত না—রাইট?'

'আপনারা তাহলে সেটাই কামনা করেছিলেন?'

'সবাই কি আর, দু'একজন করে থাকতে পারে,' বলল কাফম্যান। 'ও কিছু না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু সব ঠিক হয়ে গেল না। ব্রিজের দিকে যাবার সময় নিজের চারপাশে বৈরী পরিবেশের আঁচ অনুভব করল রানা। শুধু অন্ধ একজন লোক এই শত্রুতা অনুভব করবে না। যে ক'জন নাবিককে পাশ কাটিয়ে এল, কেউ ওকে আসতে দেখেছে বলে মনে হলো না। তাগড়া এক যোয়ান, দৈত্যাকৃতি, হাঁটু গেড়ে বসে কম্প্যানিয়নওয়েের মেঝে পরিষ্কার করছে, আচমকা রানার পায়ের সামনে ঠক করে বসিয়ে দিল বালতিটা।

'সরাও ওটা, হিগিন!' অ্যাকটিং মেট ধমকে উঠল।

মুখ তুলে তাকাল দৈত্য। 'তোমাকে দেখতে পাইনি,

কাফম্যান...,' তাড়াতাড়ি বালতিটা সরিয়ে নিল সে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রানা ভাবল, আইসবার্গ অ্যালিতে পাঠানো হয়েছে ওদেরকে, সেটাই ওদের রাগের একমাত্র কারণ হতে পারে না। এর পিছনে আরও কোন কারণ আছে। কাফম্যান তাকে সবকথা বলেনি। কেন্ রাসেলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী করা হচ্ছে ওকে–টীম লীডার মাসুদ রানাকে।

মর্মান্তিক কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, নিজেকে সাবধান করে দিল রানা। আইসব্রেকারে যারা চাকরি করতে আসে তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ক্রাইম রেকর্ড থাকে। হিংস্র, প্রতিশোধপরায়ণ, দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছাড়া এই পেশায় কেউ আসে না। ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যানের মন্তব্যও উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

'আপনার জায়গায় আমি হলে, কেবিন থেকে বেরুতাম না, মি. রানা। আপনার বিশ্রাম দরকার।'

উঁচু ব্রিজ থেকে সামনের বরফ ভাল দেখা যায়। আরেকটা ধাক্কা দেয়ার জন্যে চ্যানেল ধরে এগোচ্ছে আইসব্রেকার। চ্যানেলের যেটুকু অংশ বরফ-মুক্ত, তা যথেষ্ট চওড়া ছিল, পোলার প্যাকে আঘাত করার জন্যে জাহাজ ঘোরাতে অসুবিধে হয়নি। বরফ ভেঙে দক্ষিণ দিকে যেতে পারলে তবেই উদ্ধার। চ্যানেলের শেষ মাথাটা এবড়োখেবড়ো, থেঁতলে আছে বরফ, কিন্তু এখনও অটুট–কিউটের বো আবার আঘাত করতেও সেখানে কোন ফাটলের সৃষ্টি হলো না।

রেইল থেকে দস্তানা পরা হাত তুলে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল রানা। 'বছরের এই সময়ে বরফ বাড়তেই থাকবে। তাড়াতাড়ি বেরুতে না পারলে বসন্ত পর্যন্ত আটকা পড়ে থাকব...'

‘আপনি আমাকে জ্ঞানদান করছেন?’ ক্যাপের নিচে ক্যাপটেনের কাঁচাপাকা ভুরু প্রজাপতির ডানার মত নেচে উঠল। ‘জাহাজ আর ক্রুদের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে শুধু আপনাদের জন্যে এখানে আসতে হয়েছে আমাকে। দয়া করে কোন ব্যাপারে নাক গলাতে আসবেন না।’

পাল্টা ঝাঁঝ দেখাতে পারে রানা, বলতে পারে আপনাদেরই একটা উপকার করে দিচ্ছি আমরা, কিন্তু তাতে শুধু সময়েরই অপচয় ঘটবে। সম্পূর্ণ শান্ত থাকল ও, কিন্তু কণ্ঠস্বরে দৃঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল, ‘ওপরে কোথাও একজন লোক রাখা দরকার আপনার, ক্যাপটেন। অন্তত আশি ফিট উঁচুতে। সে আপনাকে গাইড করবে, বলে দেবে বরফের কোথায় আপনি আঘাত করবেন। ধাক্কা দেয়ার পর কোথাও যদি সামান্য চিড় ধরে, একমাত্র সে-ই দেখতে পাবে…’

‘আসুন আমার সাথে!’ রানার কথা শুনে ক্যাপটেনের রাগ যেন আরও এক ডিগ্রী বাড়ল। জাহাজ থামাবার নির্দেশ দিয়ে ব্রিজের পিছনে বেরিয়ে এলেন তিনি। পিচ্ছিল মই, ধাপগুলো থেকে খানিক আগে বরফ পরিষ্কার করা হয়েছে। ডেকে অনেক মানুষ, কোদাল দিয়ে বরফ তুলে জাহাজের বাইরে ফেলছে। রানা দেখল, কিউটের সিকোরস্কি ল্যান্ড করার জন্যে ফিরছে। ‘রুশদের ওপর চোখ বুলিয়ে এল,’ ক্যাপটেন বললেন। ‘আপনি যেমন পরামর্শ দিয়েছিলেন। আধ ঘণ্টা আগে একটা সাব-কিলার ওদেরকে তুলে নিয়েছে।’ বিশাল মাস্তুলের গোড়ায় এসে দাঁড়াল ওরা। ‘নজর ফেলে দেখুন,’ বাঘের মত গরগর করে উঠলেন ক্যাপটেন।

বিশাল কাঠামোটা খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠে গেছে, চাঁদের

আলোয় সবটুকু দেখা গেল। থামের ডগা এবড়োখেবড়ো আর ভাঙা, কিন্তু ক্রস-ট্রী অক্ষত রয়েছে। এত নিচে থেকেও বোঝা গেল, ক্রস-ট্রীর গায়ে বরফের আবরণ জমেছে। দু'জন নাবিক বরফের প্রকাণ্ড একটা চাঁই ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ সেটা ফেলে দিল। সময় মত সরিয়ে না নিলে রানার ডান পা ছাতু হয়ে যেত। 'ফের করো,' গর্জে উঠলেন হ্যারি গোল্ডম্যান, 'তোমাদের আমি কয়েদ করব। যাও, পোর্ট সাইডে নিয়ে গিয়ে ফেলো ওটাকে।' ক্রুরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর গম্ভীর সুরে বললেন, 'রাসেলকে ওরা সবাই ভালবাসত।'

'আর, তার মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করছে ওরা।'

'তা আমি বলিনি! এবার, ফর গডস সেক, মাস্তুলটা দেখুন! আপনি তো বলেই খালাস, কোন মানুষকে ওখানে উঠতে বলা যায়?'

মাস্তুলের গা ঘেঁষে একটা ধাতব মই ওপর দিকে উঠে গেছে, প্রতিটি ধাপ বরফে মোড়া, চাঁদের আলোয় চকচক করছে। মাস্তুলের গোটা কাঠামো থেকে বরফের ঝুরি নেমে এসেছে, সবচেয়ে লম্বা ঝুরিটা নেমে এসেছে ক্রস-ট্রীর ডগা থেকে। ডেক থেকে মাস্তুলটাকে বরফের তৈরি একটা থামের মত লাগল। এটা বেয়ে কারও পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়।

'বলেছি ওপরে একজন লোক থাকা দরকার, কাউকে পাঠাতে বলিনি,' জবাব দিল রানা। 'আমি নিজেই ওখানে উঠতে পারি। আমাকে আটকে রাখার জন্যে লেদার স্ট্র্যাপ দরকার, মাস্তুলকে ঘিরে থাকবে ক্যানভাস প্যাড, আর ব্রিজের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যে একটা টেলিফোন সেট...'

‘আর আপনার লাশ দেশে পাঠাবার জন্যে একটা কফিন,’ রানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কে যেন বলল পিছন থেকে।

‘ও শেরম্যান, কপ্টারের পাইলট,’ একটু ভারী গলায় বললেন ক্যাপটেন।

রানা জাহাজে ওঠার পর এই প্রথম একজন লোক সৌজন্য দেখিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল। একহারা চেহারা, শেরম্যানের বয়স হবে রানারই মত। কথার খেই ধরে আবার বলল সে, ‘আপনার তো বরফে থাকতেই মরে যাওয়ার কথা ছিল, মি. রানা। দৈবাৎ যখন বেঁচেই গেছেন, জাহাজ কুইবেকে না পৌঁছুনো পর্যন্ত কেবিনেই বন্দী থাকুনগে। একদিন না একদিন সেখানে আমরা পৌঁছুবোই।’

চেহারায় অকারণ আক্রোশ নিয়ে মাস্তুলের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপটেন। ‘মানলাম ওখানে একজনের থাকা দরকার, কিন্তু থুথু ফেলা ছাড়া আপনি ওখানে কি কাজে আসবেন?’

‘কিউটের সিসটার শিপ ফ্র্যাংকেনস্টাইনে এই কাজই করেছিলাম,’ জবাবে বলল রানা। ‘বাফিন বে-র উত্তরে, বছর তিনেক আগে। স্মিথ সাউন্ডে যাবার চেষ্টা হচ্ছিল, এই একই সমস্যায় পড়ে যায়–সামনে নিরেট বরফ। এলাকাটা আমি চিনি, কাজেই গাইড করে এগিয়ে নিতে আমার অসুবিধে হয়নি।’

‘বব হাডসনের জাহাজ ওটা।’ নতুন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যান। মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই চোখ ফিরিয়ে মাস্তুলে চোখ তুললেন। ‘মাস্তুলে আগেই প্যাড জড়ানো হয়েছে, টেলিফোন বক্সও তোলা হয়েছে–আইসফিল্ডে নজর বুলাবার জন্যে কাফম্যান একবার

উঠেছিল। কিন্তু প্যাকে ধাক্কা দেয়ার আগে ওকে নামিয়ে আনি।'

'হ্যাঁ, বব হাডসনই তখন ফ্র্যাংকেনস্টাইনের ক্যাপটেন ছিলেন,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'পরে তিনি আমাকে একটা সার্টিফিকেট দেন, লোকে যাতে বিশ্বাস করে স্মিথ সাউন্ডে আমার চেয়ে ভাল গাইড আর কেউ নেই। রেডিও জ্যামিঙের ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার আমাদের।'

'কমরেডদের মেজাজ খারাপ থাকলে এই-ই করে। জাহাজ যখন বরফে ধাক্কা দেবে, মাস্তুলের ডগায় কেউ থাকলে কি অবস্থা হবে তার, আপনি জানেন? জেনেশুনে আপনাকে আমি মরতে পাঠাব?'

ডেকের চারদিকে তাকাল রানা। ক্রুরা শাবল দিয়ে বরফ ভাঙছে, কোদাল দিয়ে সেই বরফ ফেলছে জাহাজের বাইরে। যার সাথেই চোখাচোখি হলো, ঝট্ করে মাথা ঘুরিয়ে নিল সে। থো করে থুথু ফেলল এক লোক, ক্যাপটেন তার দিকে কটমট করে তাকাতেই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। 'মরলে,' ক্ষীণ একটু হেসে বলল রানা, 'অন্তত আপনার লোকেরা কেউ দুঃখ পাবে না।'

তিন ঘণ্টার ঘুমে ক্লান্তি দূর হয়নি, সারা শরীর ব্যথা করছে রানার। বরফ মোড়া মই বেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠতে শুরু করল ও। উঠে যাচ্ছে মানুষ নয়, যেন কাপড়ের একটা বস্তা, লেদার চেস্ট-স্ট্র্যাপ পেঁচিয়ে রেখেছে শরীরটাকে। দ্বিতীয় স্ন্যাপ-ক্লিপ স্ট্র্যাপ দিয়ে মাস্তুলকে জড়িয়ে বাঁধা হবে, সেটা ঝুলছে। ফার হুডের নিচে ঠিক জায়গামত বসিয়ে নেয়া হয়েছে টেলিফোন হেডসেট। ওর নিচে,

ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। দশ মিনিট আগের শত্রুতার পরিবেশ একটু যেন বদলে গেছে। কাজ থামিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, বিপজ্জনক মই বেয়ে উঠে যেতে দেখছে রানাকে। দ্বিতীয়বার ডেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে পরিবর্তনটা লক্ষ করেছিল রানা, অবজ্ঞার সাথে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।–যা খুশি ভাবুক শালারা।

ডেক থেকে বিশ ফুট উঠে থামল ও, বুটের আঘাতে বরফ ভাঙতে গেল। পিছলে গেল পা, দস্তানা পরা হাত একটা ধাপ শক্ত করে ধরে আছে। বুটের প্রচণ্ড লাথি খেয়েও বরফ ভাঙল না। শক্ত বরফের তৈরি মই বেয়ে উঠছে ও। আবার উঠতে শুরু করে অনুভব করল, সাব-জিরো টেমপারেচার দু'জোড়া দস্তানা ভেদ করে আঙুলে কামড় বসাচ্ছে। মুখে হিম বাতাসের ছ্যাঁকা খাওয়া বন্ধ হয়েছে, ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে চামড়া আর পেশী। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে, পানি গড়াচ্ছে দুই কোণ থেকে। মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। গলায় এমন ঠাণ্ডা লাগছে, যেন ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে বাতাস।

যত ওপরে উঠল রানা নির্দয় শীত ততই ওর স্বাভাবিক শক্তি কেড়ে নিতে থাকল। জ্যান্ত, কিন্তু থেমে থাকা এঞ্জিনের একঘেয়ে আওয়াজ কখনও শুনছে কখনও শুনছে না। বো-র ওপর ফিট করা সার্চলাইটের আলো কখনও দেখছে কখনও দেখছে না। দক্ষিণে বরফের বিস্তারকে এই মনে হলো চুনকাম করা দেয়াল, তারপরই মনে হলো গুলি খাওয়া পাখির সাদা পালক।

চল্লিশ ফিট উঠেছে, চেস্ট-স্ট্র্যাপ থেকে ঝুলে পড়া স্ন্যাপ-ক্লিপ একটা ধাপে আটকে গেল। উঠে যাচ্ছে রানা, জানে না কি ঘটছে।

নিচের ধাপে এক পা, আরেক পা ওপরের ধাপে উঠছে, আচমকা শূন্যে ঝাঁকি খেলো শরীর। ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হলো, তাল হারিয়ে ফেলল রানা। ওপরের ধাপে পৌঁছুল না পা, নিচের দিকে হ্যাঁচকা টান খেলো শরীর। নেমে এল বুট, নিচের একটা ধাপ ছুঁই ছুঁই করল, কিন্তু ছুঁলো না। আরেক ধাপ থেকে হড়কে গেল দ্বিতীয় পা। খসে পড়ল শরীর।

ডেক থেকে চল্লিশ ফিট ওপরে ঝুলে থাকল রানা, শুধু হাত দিয়ে ধরে আছে বরফ মোড়া মই। পিচ্ছিল, মসৃণ বরফ, দস্তানাপরা হাত স্থির হতে পারল না। পা দুটো শূন্যে এলোপাতাড়ি ঝাঁকি খেলো, চোখে না দেখে ধাপের স্পর্শ পেতে চাইল ও। মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফ। আতঙ্কের হিম শীতল ঢেউ বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। মই থেকে একটা হাত খসে গেল। পলকের জন্যে নিচের ডেক দেখতে পেল রানা। খুদে শরীরগুলো পাথর বলে ভুল হয়। দ্বিতীয় হাতটাও খসল, তবে শরীরটা নিচে নামতে শুরু করার আগেই একটা ধাপে ডান পা ঠেকল। দ্বিতীয় হাত আবার আঁকড়ে ধরল মই। ডান পায়ের ওপর শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে বাঁ পা-টাকেও আরেক ধাপে তুলল ও। দম নেয়ার জন্যে থেমে আছে। নিচের দিকে আরেকবার তাকাল। মূর্তিগুলো এক চুল নড়ছে না এখনও। ডেকের প্রতিটি মানুষ মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হার্টবিট স্বাভাবিক হয়ে আসতেই আবার উঠতে শুরু করল ও।

ডেক থেকে আশি ফিট উঠে আবার থামল রানা। ইস্পাতের মই ক্রস-ট্রীর ঠিক নিচেই শেষ হয়েছে। ক্রস-ট্রী পেরিয়ে যেতে হবে ওকে, পেরিয়ে গিয়ে ওটার দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসতে হবে,

তারপর আরও ওপরে উঠে যাওয়া মাস্তুলের গায়ে বাঁধতে হবে চেস্ট-স্ট্র্যাপ। কোন ট্র্যাপ-ডোর নেই, কাজেই ক্রস-ট্রীকে পাশ কাটিয়ে উঠতে হবে ওকে। ঝুঁকিটা নেয়ার আগে হাত উঁচু করল রানা, ক্রস-ট্রীর ওপর দিকটা মুড়ে থাকা ক্যানভাস প্যাড পরীক্ষা করল। হাতের ছোঁয়ায় প্যাড ঘুরে গেল, তারমানে স্থির হয়ে বসার সুযোগ মিলবে না।

ক্রস-ট্রী পেরোতে দশ মিনিট লেগে গেল। দুই উরুর মাঝখানে থাকল মাস্তুল, দ্বিতীয় স্ট্র্যাপটা মাস্তুলের চারদিকে জড়িয়ে বাঁধা হলো। টেলিফোন বক্স আগেই তোলা হয়েছে, বক্সে টারমিনালগুলো জোড়া লাগানো হলো। হঠাৎ অনুভব করল রানা, কাপড়ের ভেতর ঘামের ধারাগুলো সড় সড় করে নামছে। গালে হাত দিতেই বরফের কুচি ঠেকল আঙুলে, হিম বাতাসে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমাট বেঁধে গেছে। ব্রিজের সাথে যোগাযোগ করার আগে চারদিকে তাকাল রানা।

হুড খানিক তুলে কান দুটো বের করল ও। না, কল্পনা নয়। চারপাশের বরফে ভৌতিক তর্জন-গর্জনের আওয়াজ। যেন রাগে অন্ধ দানবকুল দাঁত কিড়মিড় করছে। তার সাথে শোনা গেল গুরুগম্ভীর ভরাট শব্দ, যেন আগ্নেয়গিরি থেকে উথলে বেরিয়ে আসছে জ্যান্ত লাভা। কিউটের আধ মাইল দূরে ব্যাপক আলোড়ন চোখে পড়ল। এত উঁচু আর দূর থেকে পাঁচিলগুলোকে নিচু দেখাচ্ছে—সচল পাঁচিল, একটার মাথায় চড়ছে আরেকটা, আরও উঁচু হয়ে ঢেউয়ের মত সরে যাচ্ছে কিউটের কাছ থেকে দূরে, দক্ষিণ দিকে। রানা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কালো ফিতের মত সরু জলরেখা টলটল করে উঠল, চওড়া হয়ে সরে যাচ্ছে দূরে।

বরফের তুমুল আলোড়ন মুহূর্তের জন্যে থামছে না। ঠোকাঠুকি, ফাটাফাটি, ধাক্কাধাক্কি, ছুটোছুটি চলছে তো চলছেই। সেইসাথে চওড়া হতে হতে এগিয়ে চলেছে সরু ফাটলটা। মন্থরগতি, কিন্তু থেমে নেই। দূর অন্ধকার একটা রেখা, সাগর বলে চেনার উপায় নেই, সেদিকেই যাচ্ছে ওটা। বরফ ভেঙে ওই ফাটলে পৌঁছুতে হবে কিউটকে।

শরীরটা ঘোরাল রানা, মাস্তুলের সাথে আটকানো চেস্ট-স্ট্র্যাপ ওকে খসে পড়তে দিল না। জাহাজের পিছন দিকে তাকাল ও। পিছনে আধ মাইল চওড়া খোলা চ্যানেল। চ্যানেলের শেষ মাথায় রুশ হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। ওটাতে চড়েই দলবল নিয়ে কিউটে পৌঁচেছে রানা। ইচ্ছে করেই কিউটের বো-র নিচে ল্যান্ড করেছিল ও, বাকি কাজটা ক্যাপটেন গোল্ডম্যান সারেন। জাহাজ খানিকটা পিছিয়ে আসে, তারপর ছুটে গিয়ে ধাক্কা দেয় বরফের উঁচু প্ল্যাটফর্মে। কিনারায় ছিল সাব-কিলার, একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায় সেটা।

কিন্তু রুশ হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ নয়, রানা তাকিয়ে আছে আরও দূরে। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর।

উত্তরে প্রবাহিত হতে শুরু করা বাতাসে ভর দিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে কালো একটা পর্দা। ভাল করে তাকালে বোঝা যায়, গাঢ় বাষ্প। আই.আই. ফাইভ যে কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল, তার সাথে এর কোন মিল নেই। নিশ্ছিদ্র কালো পাঁচিল, কয়েকশো ফিট উঁচু, জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। আর্কটিকের ভয়াবহ যতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, এটা তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক। আর্কটিকে বার কয়েক এলেও, এই বিপদের মধ্যে

আগে রানাকে পড়তে হয়নি। এ-ও কুয়াশা, তবে হিমেল আবহাওয়ায় জমাট বেঁধে গেছে। আবহাওয়ার এই বিপজ্জনক রূপ আর্কটিকে কদাচ দেখা যায়, আক্রান্ত মানুষ ফ্রস্ট বাইটের শিকার হতে পারে। মাস্তুলের মাথা থেকে নামার আগেই যদি এসে পড়ে কুয়াশা, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মারা যাবার ভয় আছে। এরই মধ্যে প্রেশার রিজ জোন ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে।

'ক্যাপটেন! রিভার্স হার!' চিবুকের কাছে ঝুলে থাকা মাইকে দ্রুত কথা বলল রানা।

ক্যানভাস প্যাডে মোড়া মাস্তুল আঁকড়ে ধরল ও। এঞ্জিনের শক্তি বাড়তে লাগল। ঝাঁকি খেলো জাহাজ, পিছনের গাঢ় পানি কেটে পিছু হটছে। যা ভয় করেছিল তা ঘটল না–কোন ঝাঁকি না, শুধু মৃদু একটা দোল অনুভব করল ও। দু'পাশ থেকে পিছিয়ে গেল আইসফিল্ড, গাঢ় পানি দেখা গেল। তারপর ধীরে ধীরে মন্থর হলো কিউটের গতি, থামল। কি আসছে জানে রানা, তলপেটের পেশী শক্ত হয়ে উঠল। তর তর করে নিচে নামার ঝোঁকটাকে দমন করে নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল ও। নির্দেশ দিল, 'হাফ স্পীড! ফরওয়ার্ড!'

'ও কে, মি. রানা, হিয়ার উই গো। হোল্ড অন টাইট।'

মাস্তুলটাকে আপন সন্তানের মত বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করল রানা, মাথাটা একপাশে সরিয়ে রেখেছে, ধাক্কা খাওয়ার জন্যে তৈরি। এঞ্জিনের পাওয়ার বাড়ল, কাঁপুনিটা উঠে এল মাস্তুল বেয়ে। সামনে এগোল কিউট। অনেক নিচে, উল্টোদিকে ছুটল আইসফিল্ড। জলরেখা ক্রমশ সরু হয়ে এল। সেদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা, জানে, জলরেখা মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে

নিরেট বরফে ধাক্কা খাবে জাহাজ।

সংঘর্ষের আওয়াজ আর ধাক্কা একসাথে এল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো গোটা জাহাজ, শরীরে ঘন ঘন হাতুড়ির বাড়ি খেলো রানা। ক্যানভাস প্যাড ছিল বলে, তা না হলে রানার কাঁধ আর বুকের হাড় পাউডার হয়ে যেত। জাহাজের কাঁপুনির সাথে ধীরে ধীরে মাস্তুলের কাঁপুনিও কমে এল। ধাক্কা দিয়ে স্থির হয়ে গেল আইসব্রেকার। বরফে গেঁথে আছে।

পেশী ঢিল করল রানা, সামনে তাকাল। জাহাজের বো-র সামনে একটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু লম্বায় মাত্র কয়েক ফিট। ফাটলের দু'পাশে তাকাল রানা, আশা, আরও হয়তো কোথাও চিড় ধরেছে।

না।

হঠাৎ খেয়াল হলো, ক্যাপটেন কিছু বলছেন। এক হাতে মাস্তুলটা আরও শক্ত করে ধরল রানা, সামনের দিকে ঝুঁকে আধ মাইল দূরে তাকাল। আগের সেই ফাটলটা আরও চওড়া হচ্ছে। গলায় উদ্বেগ নিয়ে আবার ওকে ডাকলেন ক্যাপটেন। 'মি. রানা, শুনতে পাচ্ছেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

'ঠিক আছি আমি। প্রথমবার তেমন কাজ হয়নি। পারলে একই জায়গায় আবার আঘাত করতে হবে।'

'রিভার্স?'

'হ্যাঁ।'

এঞ্জিনের শক্তি বাড়তে লাগল। মাস্তুলের ডগায় বসে অনুভব করল রানা, বরফ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে আইসব্রেকার। প্রচণ্ড ধাক্কায় ফাঁক হয়ে গেছে বরফ, জাহাজের বো-কে ভেতরে

ঢুকিয়ে নিয়ে চারদিক থেকে চেপে বসে আটকে ফেলেছে ওটাকে। সব ক'টা এঞ্জিনের সমস্ত শক্তি দিয়ে পিছু হটার ব্যর্থ চেষ্টা করল কিউট। ধীরে ধীরে এঞ্জিনের গর্জন কমে এল। একটু পর দ্বিতীয়বার বাড়তে শুরু করল। রানার মনে হলো এবারও ব্যর্থ হয়েছেন ক্যাপটেন, এই সময় বরফের কঠিন থাবা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল জাহাজ। বো-র কাছে নিরেট বরফ বিস্ফোরিত হলো, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল বিস্ফোরণের শব্দ। পিছু হটছে জাহাজ, পোর্ট সাইডের বরফে গাঢ় রঙ লেগে রয়েছে।

পিছন দিকে তাকাল রানা। গোটা প্রেশার রিজ এলাকা ঢেকে ফেলার কাজ শেষ, সমতল বরফের বিস্তারকে গ্রাস করতে আসছে কুয়াশা। খুব বেশি দূরে নেই, জাহাজ ঢাকা পড়ে যাবে। কিউট না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। তারপর নির্দেশ দিল, 'হাফ স্পীড! ফরওয়ার্ড!'

ক্যাপটেন এবার চ্যানেল ধরে আগের চেয়ে বেশি পিছিয়ে এসেছেন, বরফের গায়ে ধাক্কা দেয়ার সময় গতি যাতে বেশি পাওয়া যায়। প্যাড মোড়া মাস্তুলকে আলিঙ্গন করল রানা। আধবোজা হয়ে আছে চোখ, নিচের দিকে দৃষ্টি। ক্রমশ সরু হয়ে আসছে জাহাজের দু'পাশে জলরেখা। রানা জানে না, ডেকে বেরিয়ে এসেছে নিয়াজ আর বিনয়, আতঙ্কে বিকৃত চেহারা নিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে রয়েছে দু'জনেই।

জলরেখা অদৃশ্য হলো। মাস্তুলের সাথে গাছের পাতার মত কেঁপে উঠল রানা। এবার আগের চেয়ে জোরে বরফের গায়ে হুমড়ি খেয়েছে জাহাজ।

এভাবে একের পর এক আঘাত হানা হলো। জায়গা বদল

করল রানা, বরফ ভাঙার জন্যে জাহাজটাকে ব্যক্তিগত হাতুড়ির মত ব্যবহার করল। আধ ঘণ্টা চলল এভাবে। তারপর মনে হলো, কিছু একটা ঘটছে। চিড় ধরতে শুরু করেছে বরফে, আঁকাবাঁকা গাঢ় রেখা ফুটছে গায়ে।

ঘটনা আরও ঘটছে। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এল রানার। এক দুই পল ভ্রান্তির ঘোরের মধ্যে থাকছে, ভুলে যাচ্ছে কোথায় সে, কি করছে এখানে। অসহ্য ঠাণ্ডাই আসল কারণ। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছে মুখের চামড়া, ক্যানভাস প্যাডে বারবার ঘষা খাওয়ার ফল। ওদিকে, কালো পর্দা দ্রুত এগিয়ে আসছে। এই কুয়াশা ওকে মেরে ফেলার আগে বরফ ভেঙে বেরিয়ে যেতে হবে ওদের। ‘রিভার্স, ক্যাপটেন!’ কর্কশ গলায় মাইকে চিৎকার করল রানা। ‘এবার একেবারে চ্যানেলের শেষ মাথায় নিয়ে চলুন।’

পিছু হটল জাহাজ। খুব বেশি পিছনে চলে এল। কালো কুয়াশার একটা বাহু কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, যেখানে রুশ সাব-কিলার চ্যাপ্টা হয়েছিল। বাহুটা ওপর দিকে উঠে এসে মাস্তুলের মাথা পেঁচাতে শুরু করল। দেখতে পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল নিয়াজের। রেইল ধরে কাঁপতে লাগল সে, ভয়ে নয়, রাগে। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অভদ্র ভাষায় চিৎকার করে উঠল, ‘ইউ স্টুপিড ইডিয়ট–গেট হার মুভিং! রানা কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে!’ কোন আরোহী ক্যাপটেনের সাথে এভাবে কথা বলে না।

হঠাৎ করেই রানার চারপাশের জগৎ ছোট হয়ে গেল। অন্ধকারে অদৃশ্য হলো সব। আইসফিল্ড গায়েব হলো, নিখোঁজ হলো নিচের পানি, হারিয়ে গেল ডেক। জাহাজ সামনে এগোল, কিন্তু আগেই এগিয়ে গেছে কুয়াশা, ফলে বেরিয়ে আসা গেল না।

পেট আর বুকের সাথে মাস্তুল জড়িয়ে ধরল ও, শ্বাস টানল বড় করে। বাতাসের সাথে ভারী, নোংরা, হিম ঠাণ্ডা কুয়াশা ঢুকল ফুসফুসে। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা কষ্ট অনুভব করল ও, মনে হলো ভেতরটা যেন তরল বরফে ভরাট হয়ে গেছে। বাতাসের জন্যে ছটফট করতে লাগল। মনে হলো, সারা শরীরে ভারী কি যেন চেপে বসছে, মাস্তুলের মাথা থেকে পড়ে যাচ্ছে ও। এগিয়ে চলেছে জাহাজ, হঠাৎ করে কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা। নিজের অজান্তে বন্ধ হয়ে যাওয়া চোখ দুটো খুলল ও। পারকার গায়ে রাশ রাশ বরফ কুচি দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। বরফের আবরণ ঢেকে ফেলছে ওকে।

'মি. রানা, আপনি কথা বলুন, মি. রানা আপনি...,' অস্থির ক্যাপটেন মুহূর্তের জন্যে থামছেন না।

'শান্ত হোন। এবারের ধাক্কায় কাজ হবে।' দম নেয়ার জন্যে থামল রানা। 'যে ফাটলটা আমরা তৈরি করেছি তার পঞ্চাশ গজ এদিকে, পোর্ট সাইডের বরফে গুঁতো মারবেন। কি চাইছি বুঝতে পারছেন?'

'ফাটলের পঞ্চাশ গজ এদিকে!' ক্যাপটেনের মনে হলো রানার কথা ভুল শুনেছেন তিনি।

'হ্যাঁ। পোর্ট সাইড! পঞ্চাশ গজ! জাহাজকে আমি ধাক্কা খাইয়ে ফিরিয়ে আনতে চাইছি স্টারবোর্ডের একটা ফাটলের মুখে। ফুল পাওয়ার!'

'ফুল পাওয়ার! আপনাকে আমি খুন করব...'

পাল্টা ধমক দিল রানা, 'প্রলাপ বকবেন না। বজ্জাত জাহাজটাকে রেসের ঘোড়ার মত ছোটান। ফুল পাওয়ার!'

‘ও কে! এ আপনার…সিদ্ধান্ত!’ শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন ক্যাপটেন, সিদ্ধান্তের জায়গায় মরণ ব্যবহার করতে যাচ্ছিলেন।

রেসের ঘোড়ার মত টগবগিয়ে সামনে ছুটল কিউট। এর আগে এঞ্জিনের এমন দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ শোনা যায়নি। গাঢ় পানি দু’পাশে সরিয়ে দিয়ে, বো-র ধাক্কায় পানিতে ঢেউ তুলে, পরবর্তী ধাক্কা মারতে যাচ্ছে ব্যারিয়ারে। অদ্ভুতই বলা যায় রানার প্ল্যান, এ-ধরনের কৌশল সাধারণত কেউ কাজে লাগায় না। দ্রুতগতি জাহাজ সমস্ত ওজন সহ পোর্ট সাইডের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে আঘাত হানবে, নিরেট বরফে ধাক্কা খেয়ে কিউটের নাক বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে ঘুরতে শুরু করবে। অর্ধবৃত্ত সম্পূর্ণ হবার আগেই স্টারবোর্ড সাইডের নির্দিষ্ট একটা বরফ টুকরোর সাথে সংঘর্ষ হবে বো-র। এই কৌশল ছাড়া সরাসরি বা অন্য কোনভাবে টুকরোটার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। এই টুকরোর ওপরই রয়েছে আঁকাবাঁকা রেখা, বহুদূর লম্বা হয়ে মিশেছে গিয়ে ক্রমশ চওড়া হতে থাকা ফাটলে।

মাস্তুলের ডগা থেকে ক্যাপটেনকে গাইড করছে রানা। পোর্ট সাইডের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে ধাক্কা না লাগলে সব ভেস্তে যাবে, কারণ তা না হলে স্টারবোর্ডের টুকরোটার ঠিক জায়গায় বো-র গুঁতো লাগবে না। ডেকে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সমস্ত লোককে ডেক থেকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন ক্যাপটেন। সর্বশক্তিতে ছুটে গিয়ে আঘাত খাবে আইসব্রেকার, খোলা ডেকে থাকা মানে ছিটকে পানিতে পড়া, নাহয় রেইলের সাথে বাড়ি খেয়ে মাথা ফাটানো।

ব্রিজে উঠে এসেছে নিয়াজ, জানালা দিয়ে মাথা বের করে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রস-ট্রীর ওপর খুদে মূর্তিটাকে রানা বলে চেনা যায় না। ফুল পাওয়ার!—ক্ষমতা থাকলে ক্যাপটেনের নির্দেশ বাতিল করে দিত সে।

মাস্তুলের ডগা থেকে পোর্টের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। বরফের শক্ত স্তর জমেছে ওর কাপড়চোপড়ে, স্তরটা আরও মোটা হচ্ছে। ক্যাপটেনকে শেষ নির্দেশ দিল ও, 'যদি দেখেন জাহাজ থামছে না, থামাবার দরকার নেই। চিড় ধরা বরফ গুঁড়িয়ে গিয়ে পথ করে দিতে পারে।' প্রতি মুহূর্তে জাহাজের গতি বাড়ল। বরফের তর্জন-গর্জন চাপা পড়ে গেল এঞ্জিনের একটানা হুঙ্কারে। অসুস্থ বোধ করল রানা। বারবার শুধু নিজেকে মনে করিয়ে দিল, মাস্তুলটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে। ধাক্কাটা এই সময় লাগল।

পোর্ট সাইড ব্যারিয়ারে তির্যকভাবে আঘাত করল কিউট। ব্যারিয়ার যেন পাল্টা ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিল জাহাজকে, প্রচণ্ডবেগে ছুটে এসে স্টারবোর্ড সাইডে বাড়ি খেলো বো। রানার নির্দেশে ক্যাপটেন তার জাহাজটাকে বিশাল একটা বিলিয়ার্ড বল হিসেবে ব্যবহার করেছেন—মেরেছেন যেদিকে, তার ঠিক উল্টোদিকে যেন আঘাত করে বল, চিড়গুলোর কাছাকাছি। এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে অন্য একটা আওয়াজ শোনা গেল, ভাঙচুরের পালা শুরু হয়েছে। পিছনের কয়েক হাজার টন শরীর নিয়ে বরফের ওপর চড়াও হয়েছে বো, সমস্ত বাধা গুঁড়িয়ে দিয়ে হেলেদুলে সামনে ছুটতে চায়।

মাস্তুলের ওপর রানা ওদিকে মরতে বসেছে। চাবুকের মত

সপাং সপাং আওয়াজ তুলে এদিক ওদিক দুলছে মাস্তুল, যে-কোন মুহূর্তে গোড়া থেকে মট করে ভেঙে যাবে বলে মনে হলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সহ্য করতে পারল রানা, তারপর সমস্ত হুঁশ-জ্ঞান লোপ পেল ওর। অবিশ্বাস্য গতিতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে মাস্তুল, একবার এদিক, একবার ওদিক। রানার পেশীতে কোন জোর থাকল না, মনে হলো ঝাঁকি খেয়ে মাথার ভেতর মগজটুকু আকৃতি বদল করেছে। দাঁতগুলো ফুটো তৈরি করে বেরিয়ে আসতে চাইল মুখের বাইরে। হাত-পা খুলে আসতে চাইল শরীর থেকে।

প্রাণপণ চেষ্টা করার পর চোখ একটু খুলতে পারল রানা। হাত দুটো এখনও মাস্তুল জড়িয়ে রয়েছে। সব কিছু ঝাপসা দেখল ও। জাহাজ থেমে রয়েছে নাকি চলছে বোঝা গেল না। নিচের দিকে তাকিয়ে বিশাল একটা ফাটল দেখতে পেল। চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছে, এই সময় বুকের কাছে ঝুলে থাকা মাইকটা চোখে পড়ল। নিজের অজান্তেই কথা বলে উঠল ও, 'চালিয়ে যান, ক্যাপটেন, থামবেন না!' মুখের ভেতর লোনা স্বাদ–রক্ত। শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে তীব্র ব্যথা। শিরদাঁড়া ভেঙে গেল নাকি? 'ফুল স্পীড অ্যাহেড, ক্যাপটেন! ফুল স্পীড...!'

বরফের ভেতর জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে টের পেয়ে ক্যাপটেন আর নতুন কোন নির্দেশ দেননি, কাজেই যেদিকে খুশি এগিয়ে চলেছে কিউট। বো-র সামনে পড়ে বরফের বিশাল বিশাল চাঁই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, কোন কোনটা দু'টুকরো হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে দু'পাশে। গায়ের জোরে ক্রমশ ভেতরে ঢুকছে আইসব্রেকার। বোর ধাক্কায় খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে ব্যারিয়ার, নিজের তৈরি পথ ধরে হেলেদুলে এগোচ্ছে কিউট। ডেকের নিচে চীফ এঞ্জিনিয়ার

তার গজের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, ডেঞ্জার পয়েন্ট ছাড়িয়ে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে কাঁটা। ক্যাপটেন সাবধান না হলে বয়লারগুলো যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে।

ব্রিজ থেকে আগের নির্দেশই রিপিট করলেন ক্যাপটেন, 'ফুল পাওয়ার!' তাঁর এই নতুন নির্দেশে জাহাজ যেন এবার সত্যি অদম্য হয়ে উঠল। বো উঠে গেল বরফের ওপর, স্রেফ শক্তি আর ভার চাপিয়ে তছনছ করে দিল নিরেট বাধা। মাস্তুলের মাথা থেকে এতক্ষণে টের পেল রানা কি ঘটছে। সামনে ফাঁক হয়ে গেছে আইসফিল্ড, ফাঁকটা চওড়া ফাটলের দিকে ছুটছে। আর কোন চিন্তা নেই, পরম স্বস্তির সাথে উপলব্ধি করল ও। এভাবেই ফাটল ধরে সাগরে পৌঁছে যাবে জাহাজ। সেই সাথে জ্ঞান হারাল ও।

মাস্তুল থেকে খসে পড়ল হাত। ক্রস-ট্রী থেকে কাত হয়ে পড়ে গেল শরীর। চেস্ট-স্ট্র্যাপের সাথে শূন্যে পেন্ডুলামের মত ঝুলতে লাগল রানা।

রানাকে নামাবার জন্যে ওপরে উঠল দৈত্য হিগিন, এই লোকই রানার সামনে বালতি বসিয়ে দিয়েছিল। মাস্তুল বেয়ে কে আগে উঠবে তাই নিয়ে প্রায় ধস্তাধস্তি শুরু করেছে নিয়াজ আর বিনয়, এই সময় ওদের দু'জনকেই অনায়াসে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। বলল, 'গরিলা থাকতে তোমরা কেন?' সত্যি কথা বলতে কি, গোটা জাহাজে সে-ই বোধহয় এই কাজের জন্যে একমাত্র যোগ্য লোক। রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক উঁচু, কিন্তু চওড়ায় দ্বিগুণ। শুধুই পেশী, চর্বির ছিটেফোঁটাও নেই শরীরে। মাস্তুল দুলছে, অথচ প্রায় তরতর করে উঠে গেল হিগিন। জাহাজ থামেনি, আগের মতই

বরফ ভেঙে এগিয়ে চলেছে।

'রানা কি মারা গেছে?' নিয়াজের পাশ থেকে বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল বিনয়, দু'জনেই ওরা মই ধরে স্থির হয়ে আছে। চাঁদের আলোয় আশি ফিট ওপরে দুলছে রানা। দুলছে মাস্তুলের সাথে, শরীরে প্রাণের কোন লক্ষণ নেই–অন্তত আছে কিনা ডেক থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

'এত সহজে মারা যাবে?' ফোঁস করে উঠল নিয়াজ। তার গলার স্বরে খানিকটা হলেও অভিমান ফুটে উঠল, যেন বলতে চায় এভাবে ওদেরকে একা ফেলে বিনা নোটিশে মারা যাবার কোন অধিকার রানার নেই। 'আমি ভাবছি অন্য কথা,' আবার বলল সে। 'স্ট্র্যাপটা ওর ভার বেশিক্ষণ সইতে পারবে না।'

হিগিনকে এখন ছোট দেখাচ্ছে। এখনও উঠে যাচ্ছে সে। ডেকে অনেক লোকের ভিড়, সবাই ওপর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ছে। কি হয় বলা কঠিন। মাস্তুল যেভাবে এদিক ওদিক দুলছে, হিগিন পড়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। রুদ্ধশ্বাসে একবার রানার দিকে, একবার হিগিনের দিকে তাকাল নিয়াজ। হঠাৎ চোখ নামিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল বিনয়।

ক্রস-ট্রীর কাছে পৌঁছে গেল হিগিন। ভুলের খেসারত মৃত্যু, অত ওপর থেকে কেউ পড়লে, পড়ার আগেই বলে দেয়া যায় লোকটা মারা গেছে।

ক্রস-ট্রীর নিচে পৌঁছে থামল হিগিন। এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে কিউটের বো অস্বাভাবিক উঁচু হয়ে উঠল। উঁচু হলো ধীরে ধীরে, কিন্তু নামল সবেগে। রেইল থেকে হাত ছুটে গিয়ে বরফ মোড়া ডেকে আছাড় খেলো নিয়াজ। পিছলে গেল

শরীরটা, দূরে একটা বাল্কহেডের গায়ে গিয়ে থামল। দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, দেখল সাহায্যের জন্যে ছুটে আসছে বিনয়। কি ঘটেছে আন্দাজ করে নিল নিয়াজ। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে দু'জনেই মাস্তুল থেকে খসে পড়েছে। নিশ্চয়ই জাহাজে পড়েনি।

একটা হাত বাড়াল নিয়াজ। 'আমাকে তোলো, বিনয়...'

বিনয়ের সাহায্য নিয়ে দাঁড়াল সে, একটা রেইল ধরে সিধে হলো। ভয়ে ওপর দিকে তাকাচ্ছে না। হঠাৎ খেয়াল হলো, বিনয় কোন্ সাহসে তাকিয়ে রয়েছে?

চোখ তুলল নিয়াজ। মাস্তুলের ডগায় কেউ নেই। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল, দেখল, ডগা থেকে অনেক নিচে নেমে এসেছে হিগিন, তার চওড়া কাঁধে ঘুমন্ত শিশুর মত নেতিয়ে রয়েছে রানা। মাস্তুল থেকে খুলে চেস্ট-স্ট্র্যাপটা নিজের কাঁধে জড়িয়ে নিয়েছে হিগিন, পিঠ থেকে রানা যাতে পড়ে না যায়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছানাবড়া হয়ে উঠল নিয়াজের চোখ–লোকটা মানুষ, নাকি আর কিছু? মইটাকে ইস্পাতের বলে চেনার উপায় নেই, প্রতিটি ইঞ্চি বরফের পুরু স্তরে মোড়া। জাহাজের সাথে বিরতিহীন দুলছে আর কাঁপছে। পিঠে ওই ভার নিয়ে লোকটা নামছে কিভাবে?

পিঠে রানা থাকায় ধাপে জোরাল চাপ দিতে পারল হিগিন, বরফের আবরণ ভেঙে বেরিয়ে এল ইস্পাত। ধাপে বরফ থাকা অবস্থায় রানাকে নিয়ে নামতে পারত না সে, পা পিছলে পড়ে যেত।

নিরাপদেই নেমে এল হিগিন। তার চেহারা গম্ভীর, থমথমে। রানা কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও সাহস হারিয়ে ফেলল

নিয়াজ। তারপর হঠাৎ দেখল, সে বাদে বাকি সবাই রানা আর হিগিনকে সাহায্য করছে। বলতে গেলে ক্রুদের মধ্যে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে।

ফাটলে পড়ল কিউট। বো-তে পানি পেয়ে সাবলীল হলো জাহাজের গতি।

সাত

‘মুখোমুখি ধাক্কা লাগলে? কি ঘটবে?’

রিসার্চ শিপ রিগার ব্রিজে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে রাডারের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাপটেন ট্রাভকিন। পাশেই দৈত্যাকৃতি কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। ব্রিজটা বিশাল, হেলমসম্যানের সামনে ইস্পাতের মত শক্ত অভঙ্গুর কাঁচের প্রকাণ্ড দেয়াল। দেয়াল জুড়ে সাজানো রয়েছে নেভিগেশন সহজ করার জন্যে যাবতীয় জটিল যন্ত্রপাতি। রুশ রিসার্চ শিপের সাথে তুলনা করলে রাডারহীন সাড়ে ছ’হাজার টনী কিউটকে মান্ধাতা আমলের বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

শক্তিশালী ডিজেল মটরগুলোর ভাইব্রেশন মৃদু গুঞ্জনের মত শোনায়। ব্রিজের সামনে ফিট করা পাঁচ-সাতটা সার্চ-লাইট ঘন কুয়াশাকে আলোকিত করে রেখেছে।

আচমকা ব্রিজের মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল বলটুয়েভ। বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠে ডেকের দিকে তাকাল ট্রাভকিন। না, হাতির পা ইস্পাত মোড়া ব্রিজের মেঝের কোন ক্ষতি করতে

পারেনি।

কয়েক হাত দূর থেকে হেলমসম্যান ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ কর্নেলের চোখ রাঙানি লক্ষ করে নিজের কাজে মন দিল সে। এবার ক্যাপটেনের দিকে ফিরল কর্নেল। 'আমার কথা আপনি শুনতে পাননি?' হুমকির মত শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ক্যাপটেন নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। ঝগড়ার মধ্যে না গিয়ে মৃদু স্বরে বলল সে, 'বলুন।'

'কি ঘটবে?' প্রশ্নটা আবার করল বলটুয়েভ, 'আমরা যদি কুয়াশা থেকে বেরিয়ে কিউটের পেটে একটা রামধাক্কা মারি বো দিয়ে?'

বিড়বিড় করে ট্রাভকিন বলল, 'আপনি একটা বদ্ধ উন্মাদ!'

সাগরে পৌঁচেছে কিউট। ডুবে যাচ্ছে।

চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, ঘনকালো কুয়াশার পর্দার ওপর কোথাও চাঁদ থাকলেও দেখা যাচ্ছে না। সার্চ-লাইটের আলোয় শুধু সামনের দিকটা খানিকদূর পরিষ্কার, উদ্ভাসিত হয়ে আছে ভীতিকর দৃশ্য।

ব্রিজ, মাস্তুল, রেইল, আর ডেক স্ফটিকের মত বরফের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। গোটা আবহাওয়া জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয়েছে। তাপমাত্রা−৩৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট, অর্থাৎ ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে একাত্তর ডিগ্রী নিচে। হিম-শীতল সাগরের চেয়ে বাতাস অনেক বেশি ঠাণ্ডা। বাতাস নয়, তরল বরফ কালো মেঘের মত ভেসে রয়েছে জাহাজের ওপর। ডেকে পাঁচশো টনের বেশি

বরফ জমেছে, স্তূপ হয়ে আছে পোর্ট সাইডে। সন্দেহ নেই উল্টে যাবে কিউট। শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। আইসব্রেকার ডুবছে।

ডেকে শুরু হয়েছে মরণপণ যুদ্ধ। আবহাওয়া আর তুষারের সাথে মানুষের লড়াই। একান্ত জরুরী কাজে যারা ব্যস্ত তারা বাদে বাকি সবাই উঠে এসেছে ওপরে। বাঁচার একটাই উপায়, সময় থাকতে জাহাজ থেকে ফেলতে হবে বরফ। যন্ত্রচালিতের মত কাজ করছে ক্রুরা, বিপদের গুরুত্ব তাদের জানা আছে। প্রতি মুহূর্তে কয়েক মণ বরফ রেইলের ওপর দিয়ে সাগরে ফেলেছে তারা, কিন্তু তারচেয়ে অনেক বেশি নতুন বরফ জমছে ডেকে। অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখছে না তারা। বাল্কহেড ল্যাম্পের আলো ঝাপসা হয়ে আছে, কারণ ল্যাম্পের কাঁচে জমাট বেঁধেছে বরফের স্তর। সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারছে না কেউ, বরফের ভারে পেটের দিকে বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ। বাতাসের জন্যে ছটফট করছে ফুসফুস, অথচ শ্বাস টানতে পারছে না–টানলেই গলার ভেতর তরল বরফ হয়ে যাচ্ছে বাতাস।

বরফে তৈরি মানুষ ওরা, প্রত্যেকের কাপড়চোপড় ঢাকা পড়েছে শক্ত আবরণে। অতিরিক্ত বিশ থেকে পঁচিশ সের ওজন বইতে হচ্ছে। শাবল, কোদাল, আর হাতুড়ি নিয়ে প্রতি মুহূর্তে আক্রমণ চলছে। বরফ ভাঙো, তোলো, ফেলো। ডেক জুড়ে দলে দলে কাজ করছে লোকজন। অবিরাম, বিরতিহীন। মন্থরগতি এঞ্জিনের আওয়াজ বরফ ভাঙার শব্দে চাপা পড়ছে। অশান্ত সাগর যেন লগি দিয়ে ঠেলে ওপরে তুলছে কিউটের সামনের দিক, পরমুহূর্তে লগি সরিয়ে নিতেই প্রচণ্ডবেগে আছাড় খাচ্ছে। তখন আর কাজ করার উপায় থাকছে না ক্রুদের, লাইফ-লাইন ধরে তাল

সামলাতে হয়, তা না হলে রেইল টপকে সাগরে পড়তে হবে।

চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল, অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই।

ঢেঁকির মত ওঠা-নামা করছে জাহাজের বো, সার্চ-লাইটের আলোয় উথালপাথাল সাগর ফুঁসছে। উঁচু ব্রিজ থেকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যান, মাঝ-আকাশ থেকে ডেকে বরফ পড়তে দেখছেন—কালো কুয়াশা স্ফটিক হয়ে নেমে আসছে নিচে। 'আমরা হারছি, কাফম্যান,' গম্ভীর সুরে বললেন তিনি। 'যতটা বরফ ফেলতে পারছি তারচেয়ে বেশি জমা হচ্ছে।'

পোর্ট উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাকটিং মেট কাফম্যান। ডেকে প্রায় রেইল সমান উঁচু হয়ে রয়েছে বরফ। আর্মার গ্লাসে মুখ চেপে ভাল করে তাকাতে গেল সে, ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা খেয়ে তাড়াতাড়ি সরে এল। খুব জোরে বরফে শাবল গাঁথতে গিয়ে বিপদে পড়ল একজন ক্রু। দূর থেকে ঠিক চেনা গেল না, সম্ভবত হিগিন। তার ডান হাতের দস্তানা খুলে গেল, বরফের ভাঁজে আটকা পড়ল কব্জি পর্যন্ত। দ্বিতীয় দস্তানাটা হাতে রয়েছে বটে, তবু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফ্রস্ট বাইটে আক্রান্ত হবে বেচারা। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল সে, কব্জিসহ আঙুলগুলো বগলের তলায় চেপে ধরেছে। সবচেয়ে কাছের সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাফম্যান ভাবল, হয়তো শেষ রক্ষা হবে না—হাতটা বরফে পরিণত হলে কেটে ফেলে দিতে হবে। লোকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারল কিনা দেখা হলো না। একটা ঢেউয়ের মাথা থেকে ছড়িয়ে পড়ল ঝর্নার মত একরাশ পানি, মাঝপথে পরিণত হলো বরফে, ঝমঝম করে শিলাবৃষ্টি হলো কাঁচে। ঝাপসা হয়ে গেল দৃশ্যটা।

'শুনলাম মি. মাসুদ রানা ভাল আছেন,' বললেন গোল্ডম্যান।

‘হ্যাঁ, সুস্থ হয়ে উঠছেন,’ কাফম্যান বলল। ‘ভদ্রলোক এই কাঁচের মত, অভঙ্গুর!’

নিয়াজের কেবিনে একা বসে রয়েছে রানা। জাহাজের খোলের সাথে ঘষা খাচ্ছে ভাসমান বরফের চাঁই, তারই ড্রাম পেটানোর মত আওয়াজ শুনছে একমনে। কেবিন পোর্ট সাইডে কাত হয়ে আছে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে ও। জানে, বরফ সরাবার জন্যে অমানুষিক খাটছে ক্রুরা, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। জাহাজ উল্টে গেলে কেউ ওরা বাঁচবে না, তবু বিপদটার কথা ভুলে গিয়ে অন্য কথা ভাবছে রানা।

কর্নেল বলটুয়েভের চেহারাটা চোখের সামনে ভাসল। তিন ঘণ্টা আগে প্রথম যখন জ্ঞান ফিরল, ওকে দেখতে এসেছিলেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।

‘আমাদের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে ওরা, মি. রানা–সোভিয়েত ট্রলার।’ ক্যাপটেনের আঙুল ছিল ভাঁজ খোলা চার্টের ওপর। ‘আমাদের পথের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে।’

‘রাডার নেই, জানলেন কিভাবে।’

‘নিজের চোখে দেখে এসেছে শেরম্যান। কুয়াশা তখনও আসেনি, সিকোরস্কি নিয়ে ফুয়েল লিমিটের শেষ মাথা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল ও। শুধু যে ট্রলারগুলোকে দেখেছে তাই নয়, ঠিক এখানটায় আরও বড় কি যেন একটা আছে।’

‘ত্রিশ মাইল দূরে। রিসার্চ শিপ রিগা?’

‘হতে পারে। ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি শেরম্যান, ও তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কালো কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায় জাহাজটা। তবে গম্বুজ আকৃতির রাডার ডোম মত কিছু একটা

দেখেছে। রিগায় এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট আছে, আমাদের স্যাটেলাইটগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখন লক্ষ রাখতে হবে ওদের যখন আমরা পাশ কাটাব কোন দুর্ঘটনা যেন না ঘটে...'

নড়েচড়ে বাঙ্কে আরও আরাম করে বসল রানা। জ্ঞান ফেরার পর প্রথম কথা হয়েছে জাহাজের ডাক্তারের সাথে। ওর কোন হাড় ভাঙেনি দেখে ডাক্তার নাকি নিজের গায়ে চিমটি কেটে পরীক্ষা করেছিল, স্বপ্ন দেখছে না তো! হাড় না ভাঙার কারণ, পরে ডাক্তার উপলব্ধি করে, রানার পরনের গরম কাপড়চোপড় আর ক্যানভাস প্যাড। মাস্তুলের সাথে ধাক্কা না খেয়ে শূন্যে ঝুলে পড়েছিল শরীরটা, সেটাও একটা কারণ। যাবার সময় ডাক্তার ওকে বলে গেছে, 'তবু সম্পূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে থাকতে হবে আপনাকে, জাহাজ কুইবেকে না পৌঁছুনো পর্যন্ত এই কেবিন থেকে বেরুতে পারবেন না।'

আপনমনে হাসল রানা। ডাক্তার জানে না, চার দেয়ালের ভেতর বন্দী থাকার মানুষ নয় সে। সত্যি, সারা শরীর থেঁতলে গেছে ওর; শুধু ব্যথা নয়, সেই সাথে অনুভব করছে ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে ধড়টা। তবু এই বিপদের সময় চুপ করে বসে থাকা যায় না। নিয়াজের জন্যে অপেক্ষা করছে ও। জরুরী কথা আছে। তারপর ব্রিজে যাবে...

উল্টোদিকের দেয়ালে চোখ রেখে কর্নেল বলটুয়েভের কথা ভাবল রানা। আই.আই. ফাইভের একটা ঘরে মিনিট কয়েক লোকটাকে দেখেছে ও। চোখের সামনে বিশাল একটা দেহ ভেসে উঠল, কামানো মাথা, অস্বাভাবিক চওড়া মুখ, চেহারায় মঙ্গোলীয়

ছাপ। নিষ্ঠুর, প্রতিশোধপরায়ণ একজন মানুষ।

কিউটের সামনে ছয়টা সোভিয়েত ট্রলার রয়েছে। এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। কিউটে ইভেনকো রুস্তভ রয়েছে। আর রয়েছে মেরিলিন চার্ট। এ-সব জানা আছে কর্নেল বলটুয়েভের। ক্যাপটেন গোল্ডম্যান বললেন, দেখতে হবে যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। কিন্তু রানা ভাবছে সম্পূর্ণ অন্য কথা।

কর্নেল বলটুয়েভের নির্দেশে রিসার্চ শিপ রিগা আর ট্রলারগুলো কিউটের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্ন হলো, লোকটা কি পরিমাণ ঝুঁকি নেবে? মার্কিন পতাকাবাহী একটা জাহাজকে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে কি? কিংবা জাহাজে চড়াও হবার স্পর্ধা দেখাবে?

লোকটার মানসিক গঠন কি রকম, তার ওপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা। যদি উন্মাদ হয়, সবই সম্ভব। উল্টোদিকের দেয়ালে চোখ রেখে ভবিষ্যৎ দেখতে পাবার চেষ্টা করল রানা।

আরও একটা দুশ্চিন্তার বিষয় মেরিলিন চার্ট। সত্যিই কি আসল চার্টটা নিয়ে এসেছে ইভেনকো রুস্তভ? টিউবের ভেতর থেকে যেটা বেরিয়েছে সেটাকেই আসল চার্ট বলে দাবি করছে সে, তার এই দাবি কতটুকু সত্যি? ওটাই যদি আসল চার্ট হবে, সেটা নিজের কাছে রাখার জন্যে আরও জেদ ধরেনি কেন?

চার্টটা নয়, টিউবটা পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল কেন?

শুরুতে রানা ধারণা করেছিল, আসল চার্টটা ইভেনকো নিয়ে আসবে না, বা নিয়ে আসতে পারবে না। ব্যক্তিগত ভাবে ও চায় না, আসল চার্টটা আমেরিকানদের হাতে পড়ুক। তাতে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হবে। এখন, ইভেনকোর দাবি যদি মিথ্যে না হয়,

নতুন একটা দায়িত্ব চাপল ওর কাঁধে। আসল মেরিলিন চার্ট ফিরিয়ে দিতে হবে রাশিয়াকে।

কিন্তু তাহলে আমেরিকানদের বুঝ দেবে কিভাবে?

তারও আগে জানতে হবে, আসল চার্টটা কোথায়।

চিন্তা করতে করতে নিজের অজান্তেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল রানা।

বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, বা বলা যেতে পারে বিপদের সমস্ত ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে হাফ স্পীডে ছুটছে কিউট। দুই ঢেউয়ের মাঝখানে সরু একটা ঢালে নাক ঢুকিয়ে দিল বো, সবেগে পোর্ট রেইলের ওপর ভেঙে পড়ল মস্ত একটা ঢেউ, সম্পূর্ণ ডুবে গেল রেইল। আবার যখন মাথাচাড়া দিল বো, পানির অর্ধেকই বরফে পরিণত হয়ে রয়ে গেল ডেকে।

দশ মিনিট আগে সিদ্ধান্তে পৌঁছান হ্যারি গোল্ডম্যান। 'ঝুঁকিটা নিতেই হবে। স্পীড বাড়িয়ে দেখা যাক কুয়াশা থেকে বেরুতে পারি কিনা।'

'জাহাজ উল্টে...,' ক্যাপটেন ঝট্ করে তাকাতে কথাটা শেষ করতে পারেনি কাফম্যান। ডুবে তো ওরা এমনিতেও যাচ্ছে, কাজেই চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

বরফ মোড়া রিগিঙের ভেতর দিয়ে শোঁ শোঁ বাতাস বইছে। গতিবেগ বেড়েছে, পঁয়ত্রিশ নট-এর কম নয়। ঢেউয়ের মাথা থেকে ছিনিয়ে এনে ডেকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে বিপুল জল-ফোঁটা। শূন্যে বরফ হয়ে উঠছে ওগুলো, ক্রুদের কুঁজো শরীরে সীসার তৈরি বুলেটের মত আঘাত করছে। বেঁচে থাকার যুদ্ধে হারছে ওরা,

প্রতিটি রণক্ষেত্রে। আগের অবস্থা এখনও বদলায়নি, যত বরফ ফেলছে নতুন করে জমছে তারচেয়ে বেশি। পোর্ট সাইডে রেইল সমান নিরেট হয়ে উঠেছে সাদা স্তূপ।

বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যাওয়ায় আরও অশান্ত হয়ে উঠল সাগর। মাঝে মধ্যেই এক আধটা ঢেউ আসছে চল্লিশ ফিট উঁচু। জাহাজের ডেকে আছাড় খেয়ে ভাঙছে সেগুলো, যেন পোর্টের দিকে কাত হয়ে পড়া মাস্তুলের ডগা ছুঁতে চায়। ডেকে দাঁড়ানো ক্রুরা লাইফলাইন ধরে ঝুলে পড়ে, পানির ফিরতি তোড়ের সাথে ভেসে যাবার আতঙ্ক গ্রাস করে সবাইকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে প্রচুর বরফ ফেলেছে ওরা, ঢেউয়ের পানি নেমে যাবার পর দেখা গেল খালি জায়গাগুলো আবার ভরাট হয়ে গেছে বরফে।

ঢেউগুলোর সাথে শক্ত বরফও থাকে। কোনটা লম্বা, কংক্রিট পিলারের মত, কোনটা চৌকো বাক্স আকৃতির। লাইফ-লাইন আঁকড়ে ধরা ক্রুরা খোদার নাম জপতে থাকে, কারণ ওগুলোর একটা ধাক্কা দিলে মৃত্যু অনিবার্য। পানির তোড়ের সাথে উঠে আসা এই রকম একটা বরফের ধাক্কায় ওদের এক লোক মারাও গেল। লাইফ-লাইন ধরে ঝুলে পড়েছিল সে, পানির তোড় তাকে ঠেসে ধরল একটা বাল্কহেডের গায়ে। পরমুহূর্তে টর্পেডোর মত ছুটে এসে তার মুখ, মাথা, আর বুক চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে দিল দেড় মণ ওজনের একটুকরো বরফ।

লাশটা ভেসে গেল সাগরে।

'ডেক খালি করা উচিত, স্যার,' পনেরো মিনিট পর মুখ খুলল কাফম্যান।

‘কেন?’ অ্যাকটিং মেটের পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপটেন, পোর্ট উইন্ডো দিয়ে নিচে তাকাতেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। পোর্ট রেইল ডুবে গেছে আবার। লোকজন দাঁড়িয়ে আছে বরফের ওপর, কিন্তু বরফ দেখা যাচ্ছে না। পানিতে সবার কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে। রেইল নেই, বরফ নেই, ওপর থেকে মনে হলো ব্রিজ একা নিজ থেকেই ভেসে আছে। পানির ছিটে বরফকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচে, ঝাপসা হয়ে গেল নিচের দৃশ্য। সরে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার কাঁচে চোখ রাখলেন ক্যাপটেন।

খানিক পর বো-র দিকে চোখ রাখার জন্যে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন তিনি। ‘না। ডেকে ওরা যেমন কাজ করছে করুক।’

‘কিন্তু, স্যার কিভাবে কাজ করবে ওরা! কোমর পর্যন্ত পানি…?’

‘এখনও কি তাই?’ অ্যাকটিং মেটকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন গোল্ডম্যান।

‘না, তা নয়, কিন্তু পরবর্তী ঢেউ এলেই আবার…’

‘ওরা কাজ করুক,’ কাফম্যানকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপটেন।

মনের গভীরে কাফম্যান জানে, ক্যাপটেন ঠিকই করছেন। প্রতি পাউন্ড বরফ ফেলার সাথে জাহাজের ভেসে থাকার সম্ভাবনা আরেকটু বাড়বে। ভেসে থাকতে পারলে আশা করা যায় এগিয়ে গিয়ে সামনে কোথাও নিরাপদ পরিবেশ পাওয়া যাবে। এই কালো কুয়াশার ভেতর থেকে বেরুতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত।

পরবর্তী ষোলো ঘণ্টা পালা করে কাজ করল ক্রুরা। প্রতিটি টীম কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম পেল, ডেকের নিচে নেমে গিয়ে ভিজে কাপড় বদলে গরম কাপড় পরল তারা, আগুনের ধারে বসে ভাজা

ভাজা করে নিল শরীর। দশ মিনিট, তারপরই আবার ফিরে আসতে হলো হিম নরকে। একদল ডেকে উঠল, আরেক দল নামল। যারা উঠল তারা বিদায় চেয়ে নিল, আর হয়তো দেখা না-ও হতে পারে।

অসহ্য শীত, তীব্র বাতাস, ঢেউ, ঢেউয়ের সাথে ছুটে আসা বরফের চাঁই, এ-সবের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে লড়ে গেল লোকগুলো। ক্যাপটেন হ্যারি গোল্ডম্যানের ব্যক্তিত্বই এই অসম্ভবকে সম্ভব করল। দৃঢ়চেতা ক্যাপটেনের নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কারও নেই। একটা টীমে স্বেচ্ছায় নাম লেখাল নিয়াজ আর বিনয়। ওদিকে ইভেনকো রুস্তভ, যার জন্যে ওদের সবার আজ এই অবস্থা, সিক-বেতে শুয়ে শুয়ে ফলের রস আর সুপ খাচ্ছে। ঘুম ভেঙেছে তার, সেই থেকে 'আমার টিউব, আমার টিউব' করে জান দিচ্ছে। অনেক কষ্টে তাকে বিছানায় আটকে রেখেছে জাহাজের ডাক্তার।

কুয়াশার গ্রাস থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এল ওরা। কি ঘটছে প্রথম টের পেল কাফম্যান। ডেকে নেমে, বরফের একটা চওড়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল সে। তারপর ক্রুদের দিকে ফিরল। সবাই বরফ ভাঙছে, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই কারও। হাতের শাবল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মইয়ের দিকে ছুটল কাফম্যান। ব্রিজে ঢুকল হাঁপাতে হাঁপাতে। 'অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে! আমরা বেরিয়ে আসছি।'

'হ্যাঁ, জানি,' বললেন ক্যাপটেন। তাঁর চেহারায় স্বস্তি বা সন্তোষের ছায়া পর্যন্ত নেই, রিয়ার উইন্ডো দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আছেন। এখনও পোর্টের দিকে কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ,

ডেকে বরফের পাহাড়। তবে আবহাওয়ার মধ্যে আরও একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। শোঁ শোঁ আওয়াজ একটু যেন কমেছে বাতাসের। ডেকের ওপর আবছা একটা আলো পড়ল, পরিষ্কার নয়—কুয়াশা সরে যাবার সাথে সাথে উঁকি দিতে শুরু করেছে চাঁদ। কুয়াশার গাঢ় পর্দা এখনও দেখা যাচ্ছে, তবে জাহাজের পিছনে সেটা, দ্রুত সরে যাচ্ছে আরও দূরে।

রাত এগারোটায় সিঁড়ি বেয়ে ফোরডেকে উঠে এল রানা। এত ছুটোছুটি কেন? কি ঘটছে? ধীরে ধীরে হাঁটছে রানা, এখনও ক্লান্ত। আরও দু'জন নাবিক ছুটে পাশ কাটিয়ে গেল ওকে, খোলা ডেকে বেরিয়ে বরফের ওপর দিয়ে দৌড় দিল। ভয়ঙ্কর কোন দুঃসংবাদ না হলে পিচ্ছিল ডেকের ওপর দিয়ে এভাবে কেউ দৌড়ায় না।

ব্রিজে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। এই আবহাওয়াতেও একটা জানালা খুলে রেখেছেন ক্যাপটেন, নাইট-গ্লাস চোখে নিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে। হেলমসম্যান, তারপর কাফম্যানের দিকে তাকাল রানা। ওদের চেহারা দেখে বুঝল, এই মুহূর্তে কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল। দু'জনেই উদ্বেগ আর উত্তেজনায় টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ধীর পায়ে খোলা জানালার দিকে এগোল রানা। জিজ্ঞেস করতে হলো না, বাইরের একটা লুকআউট পয়েন্ট থেকে ভেসে এল এক লোকের রোমহর্ষক চিৎকার, 'আইসবার্গ অন দি পোর্ট বো! আইসবার্গ অন দি স্টারবোর্ড বো! আইসবার্গ অ্যাহেড!'

আট

প্রশ্নটা আবার করল কর্নেল বলটুয়েভ।

'না!' বিস্ফোরিত হলো ট্রাভকিন। 'আমাকে মাফ করুন। এ নির্দেশ আমি দিতে পারব না। তারচেয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইব...'

'কে আপনাকে অব্যাহতি দিচ্ছে?' নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল কর্নেল।

'রেডিও-জ্যামিং থামাবার নির্দেশ দেব আমি,' ঝাঁঝের সাথে বলল ট্রাভকিন, 'তারপর মস্কোয় সিগন্যাল পাঠাব...'

'কি করে?' হাসি হাসি মুখ করে তাকাল কর্নেল। 'কি করে আপনি রেডিও জ্যামিং বন্ধ করার নির্দেশ দেন? আপনার এই জাহাজে স্পেশাল সিকিউরিটির একটা ডিটাচমেন্ট আছে, ভুলে গেছেন? জ্যামিং সেকশনের নিয়ন্ত্রণ অনেক আগেই নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে তারা।'

ব্রিজের পেছনে চার্টরুমে দাঁড়িয়ে দশ মিনিটের বেশি হয়ে গেল তর্ক করছে ওরা। হিটিং সিস্টেম পুরোদমে চালু, রীতিমত ঘামছে কর্নেল। পারকা আগেই খুলে ফেলেছে, কামানো মাথা থেকে টুপিটাও নামাল এবার। রিসার্চ শিপ রিগার ক্যাপটেন ট্রাভকিনকে পথে আনতে বেগ পেতে হবে, আগেই ধারণা করেছিল সে। কাজেই চোটপাট না দেখিয়ে কৌশলে এগোচ্ছে।

'এটা একটা রিসার্চ শিপ, আমার ওপর নির্দেশ আছে সামুদ্রিক

গবেষণা...'

'আরে রাখুন, মাকে মামা বাড়ির গল্প শোনাবেন না। আপনারা আমেরিকান স্যাটেলাইটের ওপর নজর রাখছিলেন। রিসার্চ, তা ঠিক, কিন্তু মিলিটারি রিসার্চ।'

'কেন, ওশেনিক রিসার্চ আমরা করছি না? ওয়াটার টেমপারেচার, স্যালিনিটি...'

'এ-সব গবেষণা বা পরীক্ষার ফলাফল শেষ পর্যন্ত কি কাজে লাগে?' নিজের কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে ট্রাভকিনের মাথার দিকে আঙুল তুলল কর্নেল। ঘন ঘন নেড়ে সচল কাঁচি বানাল একজোড়া আঙুলকে, বোঝাতে চাইল ক্যাপটেনের উচিত মাথার চুল ফেলে দেয়া। 'সাবমেরিন চালাবার কাজে, ঠিক? সবাই জানে, আপনাদের যোগাড় করা সমস্ত ডাটা আমাদের ইন্টেলিজেন্স দফতরে চলে যায়...'

'আপনি যাই বলুন, এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়!' উত্তেজিত ট্রাভকিন চড়া গলায় কথা বলছে। 'আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটকে আমি ডোবাতে পারব না। আপনি বদ্ধ একটা উন্মাদ! কিউটকে ডোবালে কেউ আমরা বাঁচব না...'

'কেন? বাঁচব না কেন? কে জানবে? কিভাবে?' মাথায় আবার হাত বুলিয়ে নিঃশব্দে হাসল কর্নেল বলটুয়েভ। 'কিউট দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, তার রাডার নেই। এটা আমরা জেনেছি দু'ঘণ্টা আগে, আমাদের একটা হেলিকপ্টার ওটাকে দেখে এসেছে। কিউটের অস্তিত্ব সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই—রেডিও-জ্যামিঙের ফলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে ওরা, হারিয়ে গেছে। ওটা এখন যদি নিজে থেকে ডুবে যায়?'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন কিউটে একটা হেলিকপ্টার আছে!'

'না, ভুলিনি।' মুখ ঘুরিয়ে চার্ট টেবিলের দিকে এগোল কর্নেল। চোখে ফুটে ওঠা দ্বিধার ভাবটুকু গোপন রাখতে চাইল। কয়েক ঘণ্টা ধরে চিন্তা করছে সে, কিন্তু কিউটের হেলিকপ্টারটাকে অকেজো করার উপায় দেখছে না। 'বজ্জাত ইভেনকো আর মেরিলিন চার্ট রয়েছে কিউটে। সেজন্যেই দুটোর একটা পথ বেছে নিতে হবে আমাদের। হয় ওগুলো ফেরত পেতে হবে, নাহয় ধ্বংস করতে হবে।'

'কিন্তু আপনি যা করতে বলছেন...'

'কই? আপনাকে তো আমি কিছু করতে বলিনি! তবে, কে না জানে যে এদিকের পানিতে বিজবিজ করছে আইসবার্গ–দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। তাছাড়া, আপনাকে তো আপনার পরিবারের কথাও ভাবতে হবে।' শেষ কথাটা বলটুয়েভ নরম সুরে বলল।

'আমার পরিবার! এর সাথে আমার পরিবারের সম্পর্ক কি?'

'বিশেষ করে আপনার স্ত্রীর কথা বলতে চাইছি।' অকস্মাৎ কাঠের মূর্তিতে পরিণত হলো কর্নেল। 'সে তো ইহুদি...'

'অসম্ভব! ডাহা মিথ্যে!'

কাঠের মূর্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। 'ঠিক আছে, পুরো নয়, অর্ধেক। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তেপান্ন। ভদ্রমহিলার মা ছিলেন ইহুদি। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন, লেনিনগ্রাদে যারা ইহুদি, তাদের খোঁজ-খবর রাখা আমার অনেক দায়িত্বের একটা?'

'আমার কাজের মধ্যে আমার স্ত্রীকে টানবেন না...'

'কমরেড ট্রাভকিন, চুপ করুন! জেনেশুনে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে চান? সোভিয়েত বিরোধী তৎপরতার জন্যে আপনার স্ত্রীকে

গ্রেফতার করা হবে, তখন কি করবেন? যে-কোন ইহুদির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে তাকে আমি ইসরায়েলে পাঠিয়ে দিতে পারি। স্ত্রীকে চিরকালের জন্যে হারাতে চান?'

'কর্নেল কমরেড, আপনার স্পর্ধা...'

'তারপর কি ঘটবে? মহিলা আশা করবেন, রাশিয়া থেকে পালিয়ে আপনিও তার কাছে আসবেন। কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে যাবে, আপনি পালাতে পারবেন না। তখন আপনার সুন্দরী স্ত্রী নিজের জীবনের কথা ভাববেন। ভাববেন, যাকে আর পাব না তার জন্যে অপেক্ষা করে নিজের জীবন নষ্ট করি কেন! নতুন কোন পুরুষের দিকে চোখ পড়বে...'

'বদমাশ...'

'হতেই হয়,' শান্ত ভঙ্গিতে বলল কর্নেল। 'আমার এই পেশায় ওটা একটা যোগ্যতা।'

ক্যাপটেন ট্রাভকিন দরদর করে ঘামছে, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল কর্নেলের দিকে। বুঝে গেছে, কোন উপায় নেই, এই লোকের কথায় নাচতে হবে তাকে। 'নিশ্চয়ই কোন বিকল্প আছে...'

'মাথায় এলে জানাবেন আমাকে।'

'আপনার হেলিকপ্টার ফিরে আসছে, মি. রানা,' ভারী গলায় বললেন হ্যারি গোল্ডম্যান।

ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, রানার দু'পাশে নিয়াজ আর বিনয়। আপনার হেলিকপ্টার বলার কারণ, প্রস্তাবটা রানার ছিল–হেলিকপ্টার নিয়ে সামনেটায় একবার চোখ বুলিয়ে আসুক

শেরম্যান, যদি সে যেতে চায়। বলার সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল শেরম্যান, কুয়াশা সরে যাবার পর থেকে মেশিন নিয়ে আকাশে ওঠার জন্যে ছটফট করছিল সে।

কালো কুয়াশা সরে গেলেও, হঠাৎ শান্ত হয়ে পড়া সাগরে পানি ছুঁয়ে রয়েছে সী মিস্ট–ভারী সাদাটে কুয়াশা। চারদিক থেকে ওদেরকে ঘিরে রেখেছে আইসবার্গ, অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দু'ঘণ্টা আগে চল্লিশ ফুট উঁচু ঢেউ ভেঙে এগোতে হয়েছে কিউটকে, এখন গুটি গুটি সামনে এগোচ্ছে ঠাণ্ডা দুধের মত পানি কেটে। এখনও পোর্টের দিকে কাত হয়ে রয়েছে জাহাজ। ক্রুরা কেউ বসে নেই, তবু এখনও প্রচুর বরফ রয়েছে ডেকে।

বড় একটা আইসবার্গ, একশো ফিট উঁচু, পোর্ট বো থেকে সিকি মাইল দূরে ভাসছে। বার্গের খাড়া পাঁচিল এবড়োখেবড়ো, গুহা আকৃতির কিছু ফাটল রয়েছে গায়ে। সাদাটে কুয়াশার একটা বেল্ট ওটার কোমর জড়িয়ে রয়েছে, আরেকটা প্যাঁচ খেয়েছে গোড়ার দিকে, তবে চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ছুঁচাল চূড়া ঝুঁকে রয়েছে ওদের দিকে। ছোট আরেকটা বার্গ, শৃঙ্গের কাছাকাছি স্প্যানিশ দুর্গের মত খাঁজ কাটা, সার সার জানালা, ভাসছে স্টারবোর্ড সাইডে–প্রায় একই দূরত্বে। ব্রিজ থেকে ওগুলোকে পিঠ-উঁচু দ্বীপের মত লাগল দেখতে–এই দেখা যায়, এই যায় না।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকল ইভেনকো রুস্তভ। 'আমার টিউব কোথায়? দিন!' রানার দিকে ছুটে এল সে।

'মি. ইভেনকো রুস্তভ!' বিস্মিত হলেন ক্যাপটেন। 'আপনি অসুস্থ! ডাক্তার আপনাকে ছাড়ল কোন্ আক্কেলে! প্লীজ, আপনি

আপনার সিক-বেডে ফিরে যান…’

‘দাঁড়ান, আগে সম্পত্তির দখল পাই, তারপর অন্য কথা!’ ক্যাপটেনকে পাশ কাটিয়ে রানার দিকে মারমুখো হয়ে এগোল রুস্তভ। ‘যখনই ওটা চেয়েছি, ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছেন আমাকে। একা ছিলাম, মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু এখন? ক্যাপটেন একজন আমেরিকান, আমি আমেরিকানদের কাছে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। কাজেই তিনি আমার দলে। ক্যাপটেন…’

‘আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না…!’ গোল্ডম্যান একবার রানা, একবার রুস্তভের দিকে তাকালেন।

‘উত্তেজিত হবেন না,’ শান্ত গলায়, ক্ষীণ একটু হেসে রুশ বিজ্ঞানীকে বলল রানা। ‘ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করছি, ক্যাপটেন। ইভেনকো রুস্তভ সাথে করে একটা মূল্যবান ডকুমেন্ট নিয়ে এসেছেন–অন্তত উনি তাই বিশ্বাস করেন। নিরাপত্তার কথা ভেবে সেটা নিজেদের কাছে রাখি আমরা।’

‘নিরাপত্তার দোহাই এখন আর কোন কাজে আসবে না!’ চড়া গলায় বলল ইভেনকো রুস্তভ। ‘আমেরিকান জাহাজে উঠে পড়েছি, কারও বাপের সাধ্যও নেই টিউবটা কেড়ে নিতে আসে। দিন, আমার জিনিস ফিরিয়ে দিন আমাকে!’

‘অবশ্যই, মি. রুস্তভ,’ বলল রানা, তাকাল নিয়াজের দিকে। ‘নিয়াজ, টিউবটা ভদ্রলোককে ফিরিয়ে দাও।’

পারকার পকেট থেকে লম্বা টিউবটা বের করল নিয়াজ। চেহারায় অনিচ্ছার ভাব নিয়ে বাড়িয়ে দিল রুশ বিজ্ঞানীর দিকে। প্রায় ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল ইভেনকো রুস্তভ।

‘মাইক্রোফিল্মটা ভেতরে আছে তো?’ কঠিন সুরে প্রশ্ন করল

সে।

‘আছে।’

‘চোখে দেখে তারপর বিশ্বাস করব,’ গজগজ করতে করতে টিউবটা উল্টো করে ধরে কয়েকটা ঝাঁকি দিল রুস্তভ। এক টুকরো কোর পড়ল তালুতে, তারপর বেরিয়ে এল থারটি ফাইভ মিলিমিটার ফিল্মের একটা অংশ।

‘আশা করি আপনার জিনিস আপনি বুঝে পেয়েছেন, মি. রুস্তভ?’ জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘মাইক্রোফিল্মের নিচে আরও কোর ছিল, সব ঠিক আছে তো? এই কোর মহামূল্যবান...’

‘ঝাঁকি দিন, না থাকলে বেরুবে না,’ নরম সুরে বলল রানা।

রানার দিকে কটমট করে তাকালেন রুশ ওশেনোগ্রাফার। ‘কেউ আপনার পরামর্শ চেয়েছে?’ ক্যাপটেনের দিকে ফিরলেন তিনি। ‘মি. গোল্ডম্যান, আপনার সাথে একা কথা বলতে চাই আমি, প্লীজ। আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। এই ভদ্রলোকদের দেখতে দিতে চাই না।’

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপটেন। ‘ব্যাপারটা কেমন হলো? মি. রানা আপনাকে এই আর্কটিক নরক থেকে উদ্ধার করে আনলেন, অথচ তাকেই আপনি অবিশ্বাস করছেন! ব্যাপারটা কি বলুন তো?’

ফোড়ন কাটল নিয়াজ, ‘আবার শর্ত দিয়েছিলেন, শুধু যদি মাসুদ রানাকে পাঠানো হয় তবেই তিনি আমেরিকায় পালিয়ে আসবেন। মাসুদ রানা নাকি ওনার হিরো...’

হঠাৎ খয়েরি দাঁত বের করে হাসল ইভেনকো রুস্তভ। ‘এখনও

আমি বিশ্বাস করি, মি. রানা অসমসাহসী যুবক। শক্ত, প্রায় অসম্ভব কাজ দিয়েও তার ওপর নির্ভর করা যায়। সেজন্যেই শর্ত দিয়েছিলাম, মি. রানাকে পাঠালে আমি আসব, নাহয় আসব না। কিন্তু তারমানে এই নয় যে উনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র। কি করে হন! মিগ-একত্রিশ চুরি করে নিয়ে গেলেন উনি, সরাসরি আঘাত করলেন সি.আই.এ. ও জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সকে। ইসরায়েলের একজন শত্রু আমার বন্ধু বা শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে না! ক্যাপটেন, দয়া করে আপনি ওদেরকে বলুন...'

'তারচেয়ে আমরাই বরং চার্টরূমে গিয়ে কথা বলি?' রুস্তভকে নিয়ে চার্টরূমে চলে গেলেন ক্যাপটেন।

ওরা বেরিয়ে যেতেই নিয়াজের সাথে চোখাচোখি হলো রানার। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল নিয়াজ।

বিনয়, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, রানার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। 'কাফম্যানকে জিজ্ঞেস করতে বলেছিলে জাহাজে বিস্ফোরক আছে কিনা...'

'পরে,' বিড়বিড় করে বলল রানা। সিকোরস্কি আর তার পাইলট শেরম্যানকে নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছে ও। এই শেষ ফ্লাইটে পাঠাবার প্রস্তাবটা ওর ছিল, ফিরে এসে জাহাজে ল্যান্ড না করা পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। দু'মিনিট পর ব্রিজে ফিরে এলেন ক্যাপটেন, আপদটাকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিয়ে এসেছেন। রানার অনুরোধে বো-র কাছে শক্তিশালী একটা সার্চলাইট জ্বালার নির্দেশ দিলেন তিনি। চোখ ধাঁধানো আলোর একটা স্তম্ভ প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেল আকাশের দিকে।

সিকোরস্কি এখনও অনেক দূরে, দক্ষিণের অন্ধকার আকাশে

খুদে একটা ব্লিপ মাত্র।

'জাহাজগুলোকে দেখতে পেয়েছে কিনা কে জানে...'

'এখনও যদি ওগুলো উত্তরের পথে থাকে, দেখতে না পাবার কোন কারণ নেই,' নিয়াজকে বলল রানা। 'সাত সাতটা জাহাজ, তাই না?'

'যেখানে খুশি থাক, আমি গ্রাহ্য করি না,' ভারী গলায় বললেন গোল্ডম্যান। 'খোলা সাগরে রয়েছি আমরা, ওদের নাকের সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাব।'

ক্যাপটেনের অগোচরে কাফম্যানের সাথে চোখাচোখি হলো রানার। দু'জনের চেহারাতেই সন্দেহের ছায়া। কাফম্যানও ভাবছে রাশিয়ানরা ঝামেলা করতে পারে।

চাঁদের আলোয় তেলের মত চকচক করছে সাগরে শান্ত পানি। এঞ্জিনের আওয়াজ ভারী, গমগমে; ধীরগতিতে এগোচ্ছে আইসব্রেকার। কুয়াশা রয়েছে, তবে দূরে দূরে, আইসবার্গগুলোর চারদিকে। সিকোরস্কির ব্লিপ এক সময় কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল। একটু পর শোনা গেল এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন।

স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল রানা। একটা সার্চলাইটের আলো সবচেয়ে কাছের আইসবার্গের দিকে তাক করা। ভাসমান বরফের পাহাড় বলে মনে হলো না, বিশাল আকৃতি নিয়ে এ যেন একটা দুর্গ। দুর্গের কাঁধের কাছে লম্বা বারান্দা, বারান্দায় সার সার গরাদহীন জানালা। বারান্দার ওপরে আর নিচে বেশ কিছু সুড়ঙ্গ দেখা গেল, বরফ-পাহাড়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত লম্বা।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিয়াজ তাকিয়ে আছে সেদিকে।

‘কি বিশাল, তাই না? গোস্ট বার্গ নয় তো?’

‘প্রার্থনা করো ভাই, তা যেন না হয়,’ আঁতকে ওঠার ভান করে বলল রানা। ‘গোস্ট বার্গ হলে তোমার একটা ধমকেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।’

অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কথাটা, ভাবল নিয়াজ, কিন্তু আর্কটিক সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিশ্বাস করানো কঠিন। কয়েক মিলিয়ন টন বরফ, মানুষের গলার আওয়াজে ধসে পড়বে, সত্যি অবিশ্বাস্য। ব্যাপারটা এস্কিমোরা জানে, ভেলা নিয়ে গোস্ট বার্গকে পাশ কাটাবার সময় ঠোঁটে তালা দিয়ে রাখে তারা, জোরে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলে না। গোস্ট বার্গ যত বিশালই হোক, তার ভিত আর কাঠামো যেমন ভঙ্গুর তেমনি দুর্বল। লক্ষ লক্ষ টন বরফ স্তূপ হয়ে আছে, ছুঁই ছুঁই করছে আকাশ, কিন্তু ভেতরটা ফাঁপা—দমকা একটা বাতাসের বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হতে পারে।

দুর্গের চূড়ায় আলোর খেলা দেখছে রানা। হঠাৎ নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না।

আইসবার্গের চূড়া বিস্ফোরিত হলো।

এই ছিল, এই নেই—কাঁধ থেকে মাথাটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আইসবার্গের ওপরের অংশ সাদাটে বরফ-কণায় ঝাপসা হয়ে গেল। বিস্ফোরণের আওয়াজ চারপাশের আইসবার্গের ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। বরফের বড় বড় টুকরো আলোর স্তম্ভ থেকে খসে পড়ল সাগরে। চূড়ার অন্তত বিশ-পঁচিশ ফিট ধসে পড়েছে। গোল্ডম্যান দ্রুত নির্দেশ দিলেন, পোর্টের দিকে কয়েক ডিগ্রী ঘুরে গেল জাহাজ।

‘গোস্ট মনস্টার যাই হোক, মুণ্ডু বিস্ফোরিত হওয়ায় বার্গ মহাশয় আমাদের দেখতে পাবে না, আশা করি নিরাপদেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারব।’

নিয়াজের কথা শেষ হতেই শেরম্যানের সিকোরস্কিকে দেখা গেল। চাঁদের আলোয় ঘুরন্ত রোটরের চাকতি আকৃতির ঝিলিক পরিষ্কার ধরা পড়ল চোখে। বোধহয় সিকি মাইলেরও কম দূরে, অনেক উঁচু থেকে দুশো ফিটে নামল, সোজাসুজি কিউটের দিকে এগিয়ে আসছে। পোর্ট সাইডে রয়েছে মুণ্ডুহীন আইসবার্গ, সেটার কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে আসতে হবে শেরম্যানকে।

সিকোরস্কি ল্যান্ড করার সময় এঞ্জিন মন্থর করতে হবে, নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন।

আইসবার্গের কোমর পেঁচিয়ে থাকা কুয়াশা ভেসে গেছে, ভিতের কাছ থেকে কুয়াশা ভেদ করে খাড়াভাবে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে বিশাল বরফের পাঁচিল।

ব্রিজে সবাই চুপচাপ, শুধু এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।

মাঝখানে একবার নিস্তব্ধতা ভাঙল নিয়াজ, ‘নিশ্চয়ই রিগাকে দেখতে পেয়েছে পাইলট।’ প্রকাণ্ড আইসবার্গ এক কথায় বোমার মত বিস্ফোরিত হলো। ভেতরের চাপ সইতে না পেরে স্রেফ বেলুনের মত ফেটে গেল। কিন্তু এবার শুধু মাথার দিকটা নয়, গোটাটাই অদৃশ্য হয়ে গেল। বিস্ফোরণের শব্দে জাহাজের প্রতিটি লোকের কানে তালা লাগল, শক ওয়েভে থরথর করে কেঁপে উঠল ব্রিজ। ওভারহেড কম্পাসের আবরণ ভেঙে গেল, হেলমসম্যানের মাথায় বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল কাঁচ। কোর্স ঠিক রাখার জন্যে ছুটে গিয়ে হুইল আঁকড়ে ধরলেন ক্যাপটেন।

আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফিরে আসতে লাগল বিস্ফোরণের আওয়াজ, প্রতিটি প্রতিধ্বনি নাড়া দিয়ে গেল কিউটকে। বার্গটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে পাঁচশো ফিট ওপর দিকে শুধু ফেনা, বাষ্প আর বরফ কণা দেখা গেল। সব যখন সী লেভেলে নেমে এল, টগবগে ফুটন্ত পানি ছাড়া দেখার কিছু পাওয়া গেল না। আইসবার্গ অদৃশ্য হয়েছে, সেই সাথে অদৃশ্য হয়েছে শেরম্যানের সিকোরস্কি।

হেলমসম্যানকে হুইল দিয়ে জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। বিষণ্ন চোখে বাইরে তাকিয়ে আছেন তিনি। সাগরকে সাগর বলে চেনা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে ছোট একটা লেক—সবগুলো দিকে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে আইসবার্গ। কোনটা দূরে, কোনটা তত দূরে নয়।

'বিস্ফোরণের সময় ঠিক মাথার ওপর ছিল শেরম্যান...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে গোল্ডম্যান বললেন, 'জানি।' অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছেন তিনি। 'ডিয়ার গড...শেরম্যান!' পাশে দাঁড়ানো রানার দিকে তিনি তাকালেন না। 'চমৎকার! আর কোন ধারণা যদি মাথায় থাকে, মি. রানা, ঢোক গিলে নিচে পাঠিয়ে দিন।'

ক্যাপটেনের কথায় রানা যে দুঃখ পেল তা নয়। মনটা শুধু আরেকটু খারাপ হয়ে গেল। নিয়াজ আর বিনয়কে ইশারায় ডাকল ও, নেমে এল ব্রিজ থেকে।

শেরম্যানের আকস্মিক মৃত্যু হতভম্ব করে দিয়েছে রানাকে। কিন্তু তারচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেছে ও সিকোরস্কি ধ্বংস হওয়ায়।

রাডার নেই।

রেডিও থেকেও নেই। রেডিও-জ্যামিঙের ফলে অকেজো হয়ে আছে সেট। কোন সিগন্যাল পাবে না, পাঠাতেও পারবে না।

বাইরের দুনিয়ার সাথে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ছিল হেলিকপ্টারটা, গেল সেটাও।

দক্ষিণে রয়েছে কর্নেল বলটুয়েভ, তাকে বাদ দিলে বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ওরা।

এক ঘণ্টা পর আইসবার্গের সাথে ধাক্কা খেলো কিউট।

নয়

'একশো পাউন্ড জেলিগনাইট, সাথে টাইমার মেকানিজম, আর কয়েকশো ফুট কেব্‌ল্‌...'

'কোথায় রাখে ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বললে বিশ্বাস করবে না—মেইন ডেকের একটা কেবিনে।' নিঃশব্দে হাসল বিনয়। 'সম্পূর্ণ নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ, কাফম্যান নিজেই স্বীকার করল। কিন্তু দরকারের সময় অতগুলো সিঁড়ি আর মই বেয়ে ওপরে তোলা ঝামেলার ব্যাপার, তাই...'

'কাজের লোকদের ভাবনা-চিন্তাই আলদা,' কাফম্যানের প্রশংসা করল রানা। 'দফতরে বসে কর্তারা নিয়ম বেঁধে দেয় ঠিকই, কিন্তু অভিযানে স্টাফদের সাথে নিয়মগুলো সঙ্গী হয় না।'

রানার কেবিনে বসে লাঞ্চ খাচ্ছে তিনজন। অফিসার্স মেসে ডেকে না পাঠিয়ে লাঞ্চ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, তারমানে সম্ভবত কষ্টার্জিত জনপ্রিয়তা আবার হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

‘আমাদের বোধহয় একঘরে করা হয়েছে,’ কফির কাপটা নামিয়ে রেখে বলল নিয়াজ। ‘শেরম্যান মারা যাওয়ায় তোমাকে দায়ী করছে ওরা, রানা।’

‘ক্যাপটেনকে অসন্তুষ্ট মনে হলো,’ বলল রানা। ‘আসলে দুশ্চিন্তায় মেজাজ বিগড়ে আছে তাঁর। রুশ জাহাজগুলোকে নিয়ে আমাদের চেয়ে উনি কম উদ্বিগ্ন নন।’

‘আমার ভয় রিগাকে,’ বলল নিয়াজ।

‘আমারও,’ সমর্থন করল রানা। ‘ষোলো হাজার টন, তাই না? ট্রলারগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া সম্ভব। কিন্তু...কি ব্যাপার, বিনয়? তোমার হাতে কি ওটা?’

বিনয়ের তালুতে একটা চাবি। ‘এক্সপ্লোসিভ কেবিনের চাবি। খোলা সাগরে রয়েছি, কেউ আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না, ক্যাপটেনের এই ধারণার সাথে একমত নয় কাফম্যান। ওকে সাথে নিয়ে কেবিনটায় ঢুকেছিলাম আমি। একজোড়া শোল্ডার-প্যাকে তোলা হয়েছে জেলিগনাইট, যদি প্রয়োজন হয়...’

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো জাহাজ, মনে হলো বাল্কহেড বিস্ফোরিত হবে। পোর্টের দিকে কাত হয়ে পড়ল কেবিন, পরমুহূর্তে সিধে হলো, তারপরই আবার কাত হলো স্টারবোর্ডের দিকে। প্রতি মুহূর্তে থরথর করে কাঁপছে জাহাজ, সেই সাথে আইসবার্গের ওপর জাহাজের চাপে বিকট শব্দে ভাঙছে বরফ।

আবার জাহাজ সিধে হতে শুরু করল। দরজার দিকে ছুটল নিয়াজ। হ্যাঁচকা টানে কবাট খুলল। বাইরে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, চিৎকার। পোর্ট সাইড থেকে বোমা ফাটার মত আওয়াজ এল, বরফ ভাঙছে। হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল

আইসব্রেকার। এঞ্জিন নামমাত্র সচল, নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বালবগুলো ম্লান হয়ে গেল, প্রায় নিভু নিভু—কয়েক সেকেন্ড পর আবার জ্বলে উঠল সবটুকু উজ্জ্বলতা নিয়ে।

'বরফে আটকে গেছি,' গুঙিয়ে উঠল বিনয়।

দরজার কাছ থেকে নিয়াজ বলল, 'যদি না গুঁতো মেরে থাকে রিগা...'

'সম্ভবত আইসবার্গে ধাক্কা খেয়েছি,' গায়ে পারকা চড়াতে চড়াতে বলল রানা। 'চলো ব্রিজে যাই।'

নির্জন কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ছুটল রানা, পারকার বোতাম লাগাবার জন্যে সিঁড়ির গোড়ায় থামল। ওপরের ডেক থেকে লোকজনের শোরগোল ভেসে এল। আতঙ্কটা কি নিয়ে বোঝা গেল না। ধাপগুলো বেয়ে ওপরে উঠল ও, দরজা খুলতেই ওকে গ্রাস করল সাদাটে কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর কালো ছায়ামূর্তি ছুটোছুটি করছে। কি ঘটছে আন্দাজ করা অসম্ভব। পোর্ট রেইলের সামনে দৃষ্টি চলে না। এমনকি পোর্ট রেইলটা পর্যন্ত দেখতে পেল না রানা। হোঁচট খেতে খেতে মইয়ের দিকে এগোল ও। কুয়াশার ভেতর থেকে প্রকাণ্ড একটা ছায়ামূর্তি ছুটে এসে ধাক্কা খেলো গায়ে। হিগিন।

'আমরা গেঁথে গেছি!' আতঙ্কে কর্কশ শোনাল হিগিনের গলা।

'ডুবছি?' রানার জ্যাকেটের তলায়, বগলে, টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা খুদে প্যাকেট। প্যাকেটের ভেতর আছে নিয়াজের দেয়া মাইক্রোফিল্ম। পারকার গায়ে হাত বুলিয়ে প্যাকেটটার অস্তিত্ব আরেকবার অনুভব করল, নিজের অজান্তেই।

'গড নোজ...'

মই বেয়ে উঠছে রানা, প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছে, এই সময় বো-র সামনে কুয়াশায় আলোড়ন উঠল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। হিমালয়ের মত কি যেন একটা, চোখে ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেল আবার। মনে হলো মাত্র কয়েক গজ সামনে।

সাবধানে ব্রিজে ঢুকল রানা, পিছু পিছু মই বেয়ে উঠছে নিয়াজ আর বিনয়। ব্রিজের সামনের দিকে, খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গোল্ডম্যান। এরইমধ্যে হিম হয়ে গেছে ভেতরটা। হেলমসম্যান হুইল ধরে রয়েছে, যদিও জাহাজ কোথাও যাচ্ছে না।

এতক্ষণে খেয়াল হলো রানার, ডানে বা বামে নয়, জাহাজ ঢালু হয়ে রয়েছে পিছন দিকে। আরেকটা জানালা খুলে পোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাকটিং মেট। সবগুলো এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকালেন ক্যাপটেন।

'এদিকে একবার আসুন, মি. রানা,' ডাকলেন তিনি। নরম সুর। 'এরচেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে না—আমরা একটা বার্গের ঢালে উঠে পড়েছি।'

অবস্থাটা বুঝতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। কুয়াশার ভেতর দিয়ে খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছিল কিউট, সরু একটা ফাঁক গলে বিশাল এক আইসবার্গের পেটের ভেতর, ছোট একটা বে-তে ঢুকে পড়েছে। ফাঁকটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে, বে-র এক মাথা থেকে আরেক মাথায় আসতে মিনিট খানেক লেগেছে জাহাজের। আইসবার্গের ঢাল ক্রমশ নিচু হয়ে বে-র পানির তলায় তলিয়ে গেছে। খোলের সাথে ডুবন্ত ঢালের প্রথম ঘষা লাগার পরপরই ক্যাপটেন সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে

জাহাজের সামনের অংশ পানি থেকে উঠে পড়েছে।

কিউটের সামনের অংশ পানির ওপর, পিছনের অংশ পানিতে। এঞ্জিন বন্ধ করেও কোন লাভ হয়নি, পিছলে নেমে আসেনি বো। শুধু বো নয়, খোলের এক তৃতীয়াংশ পানির ওপর জেগে থাকা ঢালে উঠে পড়েছে। ছোট্ট বে-র চারদিকে কুয়াশা, মাঝে মধ্যে কুয়াশা আলোড়িত হলে আকাশ-ছোঁয়া আইসবার্গের খাড়া, মসৃণ পাঁচিল দেখা যায়।

'যীসাস!' ব্রিজের পিছন থেকে গুঙিয়ে উঠল কাফম্যান। 'এর ভেতর আমরা ঢুকলাম কিভাবে!'

হুড়োহুড়ি করে পিছনের জানালার সামনে চলে এল সবাই। চোখ পিট পিট করলেন গোল্ডম্যান। আপাতত সামান্য একটু সরে গেছে কুয়াশা, জাহাজের পিছনে ছোট বে-র ফাঁকটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এই ফাঁক গলেই আইসবার্গের পেটের ভেতর সেঁধিয়েছে কিউট। ফাঁকের দু'দিকে আইসবার্গের উঁচু, চওড়া পাঁচিল। তাজ্জব ব্যাপার, এরকম সরু একটা ফাঁক গলে কিভাবে ভেতরে ঢুকল জাহাজ! এক মুহূর্ত পরই আবার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল ফাঁকটা।

'মাপজোকে যদি ভুল না হয়, আর ভাগ্য যদি বেঈমানী না করে,' চিন্তিতভাবে বললেন ক্যাপটেন, 'আবার সাগরে বেরোতে পারব আমরা। জাহাজের বেশিরভাগ অংশ এখনও পানিতে, প্রপেলার উল্টোদিকে ঘোরালে ঢাল থেকে নেমে আসবে।' বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। 'এমন উৎকট বিপদে কেউ কখনও পড়েছে!'

'বরফ নেই, আপনি জানেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করল

কাফম্যান। ‘ঢালের সাথে খোলের ধাক্কা লাগতেই ঝাঁকি খেয়ে খসে পড়েছে সব। এদিকে আসুন, দেখে যান।’

পোর্ট উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ঢাল থেকে সরে গেছে কুয়াশা। ডেকে ওঠার সময় পোর্ট রেইল দেখতে পায়নি ও, কারণটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। নেই, দেখবে কোত্থেকে? সংঘর্ষের ধাক্কায় পোর্ট সাইডের রেইল সহ কয়েকশো মণ বরফ ঢালের ওপর ছিটকে পড়েছে। রেইলের ভাঙা টুকরো-টাকরা ঢালের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেল। ঢালে কয়েকজন ফার মোড়া লোককেও দেখল রানা। রশির মই বেয়ে নেমেছে ওরা। কুয়াশার ভেতর ভূতের মত দেখাল ওদেরকে। ক্যাপটেনের নির্দেশে ঘুরেফিরে দেখছে ওরা, আইসবার্গটা কি ধরনের জানতে হবে।

মই বেয়ে একটা ছায়ামূর্তি জাহাজে উঠে এল। চিনতে পারল রানা। নিয়াজ।

ব্রিজে ফিরে এসে নিয়াজ বলল, ‘না, গোস্ট বার্গ নয়…’

‘ঠিক জানো?’

‘অবশ্যই। বিনয় আর আমি যতটা সম্ভব উঁচুতে উঠে দেখেছি–কোথাও একটু ফাঁক-ফোকর নেই, একেবারে নিরেট বরফ…’

‘সামনেটা এখন দেখা যাচ্ছে!’ ক্যাপটেনের উত্তেজিত গলা শুনে ব্রিজের সামনে ছুটে এল সবাই। বিরতিহীন মোচড় খেয়ে চলেছে কুয়াশা, মাঝে মধ্যে দু’এক মুহূর্তের জন্যে ভেসে গিয়ে কোন কোন দিক উন্মোচিত করছে। বো-র সামনে থেকে কুয়াশা সরে যাওয়ায় আইসবার্গের বিশালত্ব ফুটে উঠল ওদের চোখের

সামনে। বো-র কাছ থেকে একশো গজ দূরে শেষ হয়েছে ঢাল, তারপর আইসবার্গের পাঁচিল খাড়া উঠে গেছে—কত উঁচু পর্যন্ত কে জানে! ওপর দিকের কুয়াশাও এবার অনেকটা সরে গেল, মনে হলো ওরা যেন বরফ ঢাকা হিমালয় দেখছে। চূড়া কত উঁচুতে বোঝার উপায় নেই, কারণ ওপরের দিকটা সাদাটে কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে।

নিখাদ, নিরেট বরফের প্রকাণ্ড দ্বীপে আটকা পড়েছে ওরা। লম্বায় দ্বীপটা আধ মাইল বা তারও বেশি হতে পারে।

'লোকজনদের ডেকে নাও,' কাফম্যানকে নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন। 'লাউডহেইলার ব্যবহার করো। চেষ্টা করে দেখব সাগরে বেরুনো যায় কিনা।'

'এখুনি বেরুতে চাইছেন?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...,' হঠাৎ থেমে গিয়ে ঝট্ করে রানার দিকে ফিরলেন গোল্ডম্যান। 'চমৎকার কোন আইডিয়া, মি. রানা?' তাঁর চেহারা ও কণ্ঠস্বরে তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠল।

'আইসবার্গের পেটে আটকা পড়ায় একদিক থেকে সুবিধেই হয়েছে,' বলল রানা। 'বুঝতে পারছেন না?'

'আপনি যে অতি বুদ্ধিমান, সে আমি প্রথমেই টের পেয়েছি,' গম্ভীর সুরে বললেন ক্যাপটেন। 'কি বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন।'

'বলছিলাম কি,' আরও নরম সুরে বলল রানা, 'এখানে তো বেশ নিরাপদেই রয়েছি আমরা। সাগরে না বেরুলেও তো চলে...'

'এভাবে আটকা পড়ে থাকব? কোথাও যাব না? আপনার বুঝি বাড়ি-ঘর নেই?'

‘কে বলল আমরা যাচ্ছি না?’ পাল্টা প্রশ্ন কলল রানা। ‘আমরা থেমে নেই, যদিও কোথাও যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না। গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট আইসবার্গটাকে দক্ষিণে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রতিদিন বিশ মাইল গতিতে এগোচ্ছি আমরা...’

‘নটিক্যাল রেকর্ড ভাঙছি কি?’ ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করলেন গোল্ডম্যান।

‘তার কি কোন দরকার আছে? ঘণ্টা কয়েক আগে শেরম্যান রিপোর্ট করেছিল, সোভিয়েত ট্রলারগুলো আমাদের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে আছে, আর রিগা আছে বিশ মাইল দক্ষিণে। এতক্ষণে আরও কাছে চলে এসেছে ওগুলো। আইসবার্গটা কিউটের জন্যে বিরাট একটা বাহনের কাজ করছে। যদি বার্গের সাথে থাকি, রাতের কোন এক সময় সোভিয়েত জাহাজগুলোকে পাশ কাটাব আমরা।’

‘বার্গের সাথে থাকা মানে আটকা পড়ে থাকা, নড়াচড়া করা যাবে না...’

‘কিছু আসে যায়? ওরা যদি আমাদের দেখতে না পায়? রিগায় আধুনিক রাডার রয়েছে বটে, কিন্তু আমরা কাছাকাছি পৌঁছুলে স্ক্রীনে কী দেখতে পাবে ওরা? স্রেফ আরেকটা আইসবার্গ।’

‘বাহন হিসেবে আইসবার্গ?’ উত্তেজনায় হাততালি দিয়ে ফেলল কাফম্যান। ‘ওয়ান্ডারফুল...’

‘ফুল!’ অ্যাকটিং মেটকে গাল পাড়লেন ক্যাপটেন। এঞ্জিন রূমের সাথে কথা বলার জন্যে ভয়েস-পাইপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কথা শেষ করে কাফম্যানের দিকে ফিরলেন। ‘চীফ এঞ্জিনিয়ার বলছে, এঞ্জিন রূমের কোথাও তেমন কোন ক্ষতি

হয়নি। গজগুলোর কাঁচ ভেঙে বা ফেটে গেছে, গরম বাষ্পে ঝলসে গেছে একজনের হাত, ব্যস। ওদের ধারণা এঞ্জিনেরও কোন ক্ষতি হয়নি, তবে চেক করে দেখব আমি। লোকগুলোকে ডেকে নিতে বলেছি, মনে আছে?'

'এঞ্জিন চালু করবেন?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাজটা উচিত হবে না। রিগার হাইড্রোফোনে ভাইব্রেশন ধরা পড়বে।'

রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কাফম্যানকে ক্যাপটেন জানালেন, 'আর তারপর, পিছু হটব আমরা, যে-পথ দিয়ে ঢুকেছি সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে যাব সাগরে।'

ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকল নিকিতা জুনায়েভ। 'কিউট খুব কাছে চলে এসেছে, কর্নেল কমরেড! হাইড্রোফোনে এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেছে!'

ট্রাভকিনকে পাশে নিয়ে ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল বলটুয়েভ, মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে জুনায়েভকে বলল, 'শান্ত হও, জুনায়েভ। পাঁচ মিনিট পর পর রিপোর্ট করবে আমাকে–যাও!'

জুনায়েভ চলে যেতে ধীরে ধীরে কর্নেলের দিকে ফিরল ট্রাভকিন। 'এখন তাহলে আবার এঞ্জিন চালু করতে পারি। আপনাকে আগেই বলেছি, এদিকের পানিতে পাওয়ার ছাড়া ভেসে থাকা সাংঘাতিক বিপজ্জনক...'

'আমি মারা গেলে,' কোমল সুরে বলল কর্নেল।

'তারমানে?'

'তার আগে এঞ্জিন চালু করা যাবে না। সর্বাধুনিক রাডার রয়েছে আপনার। ব্যবহার করুন! নিঃশব্দে ভেসে যেতে হবে

আমাদের, কারণ তাহলেই শুধু হাইড্রোফোন অপারেটররা ওদের এঞ্জিনের আওয়াজ ঠিকমত শুনতে পাবে। কিউটের সঠিক পজিশন জানতেই হবে আমাকে।'

পাইপটা মুখে তুলে জানালার সামনে চলে এল কর্নেল। একা তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাপটেন ট্রাভকিন। ক্লিয়ারভিশন প্যানেলে চোখ রেখে কুয়াশা আর সাগরের আলাদা একটা জগৎ দেখতে পেল কর্নেল। ওখানে কোথাও, দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে আইসবার্গ। ঠিক এই মুহূর্তে রাডার অপারেটররা দৈত্যাকৃতি বার্গগুলোর কোর্স জানার চেষ্টা করছে। গ্রীনল্যান্ড কারেন্টের সাথে বিরতিহীন দক্ষিণ দিকে ভেসে চলছে ওগুলো।

সবাই এখন জাহাজে। এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। ব্রিজে যার যেখানে থাকার কথা সবাই উপস্থিত। প্রতিটি লুক-আউট পয়েন্টে লোক পাঠানো হয়েছে। আইসবার্গ থেকে নামার জন্যে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ।

পিছনে হাত বেঁধে জানালা দিয়ে কিউটের পিছন দিকে তাকিয়ে আছেন গোল্ডম্যান। উদ্বেগ আর উত্তেজনা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তিনি, সমস্ত শরীর টান টান হয়ে আছে। উত্তেজনা বোধ করা স্বাভাবিক, কারণ একই সাথে দুটো বিপজ্জনক কাজ সারতে যাচ্ছেন তিনি। বরফের ঢাল থেকে কিউটকে নামাবেন, তারপর বে-র দুই বাহুর মাঝখানের সরু ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করবেন সাগরে।

ক্যাপটেন আর কাফম্যানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রানাও জাহাজের পিছন দিকে তাকিয়ে আছে। বে ছাড়িয়ে আরও দূরে

চলে গেছে ওর দৃষ্টি, কুয়াশার ভেতর। বার বার আড়চোখে রানার দিকে তাকাল কাফম্যান। ক্যাফটেন যা করতে যাচ্ছেন তাতে তার সমর্থন নেই, কিন্তু অ্যাকটিং মেট হিসেবে ক্যাপটেনের সাথে তর্ক করাও তার সাজে না।

এঞ্জিনগুলো আরও শক্তি সঞ্চয় করল। একটু পরই নড়ে উঠবে জাহাজ। পিছু হটবে। প্রপেলার যদি পারে, বরফের ঢাল থেকে নামিয়ে আনবে জাহাজকে।

স্টার্নে, লুক-আউট পয়েন্টের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল নিয়াজ। হঠাৎ দমকা বাতাসের মত ব্রিজে ঢুকল সে।

'স্টপ ইট, ফর গডস সেক!' তারস্বরে চিৎকার করল সে। 'বন্ধ করুন, এঞ্জিন বন্ধ করুন!'

'কেন?' বোমার মত ফাটলেন যেন ক্যাপটেন।

'বাইরে তাকান,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিয়াজ। 'কুয়াশার ভেতর থেকে কি যেন একটা বেরিয়ে আসছে!'

'কি?' চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন।

'জানি না,' রুদ্ধশ্বাসে বলল নিয়াজ। 'বিরাট বড় কি যেন একটা...'

'আমি জানি কি,' ভারী গলায় বলল রানা। 'মি. গোল্ডম্যান, প্ল্যানটা বাতিল করুন। জাহাজ নড়লে বিপদ বাড়বে...'

'ঈশ্বর বাঁচাও,' বিড়বিড় করে উঠল কাফম্যান। 'রিগা! রিগা আসছে আমাদের ধাক্কা...'

কিন্তু না। রিগা নয়। রিগা মাত্র ষোলোশো টনী জাহাজ, কিন্তু কুয়াশার ভেতর থেকে ওটা যেটা এগিয়ে আসছে তার ওজন কয়েক লক্ষ টন, বাইশতলা একটা বিল্ডিঙের মত উঁচু। সচল

একটা বিল্ডিং, ওপরের অংশ যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কিউটের মাস্তুলকে ছাড়িয়ে গেছে। ধীর গতিতে কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসছে। ভয়াল-দর্শন এক আইসবার্গ।

স্টার্নের লুক-আউট পয়েন্ট থেকে লোকগুলো আর্তনাদ করে উঠল। জানালার বাইরে তাকালেন গোল্ডম্যান। বাকি সবাই তাঁর গা ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

সচল পাহাড় ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল ওরা। কুয়াশা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে বে-র দিকে। বে থেকে এখনও অনেকটা দূরে ওটা, কিন্তু তবু মনে হলো মূর্তিমান বিভীষিকার চূড়া, যতটুকু দেখা যায়, ঝুঁকে রয়েছে ওদের মাথার ওপর। বে-র দুই বাহুর মাঝখানে সরু ফাঁকটা বুজে এল।

মাইকে কথা বললেন গোল্ডম্যান। বিপদ টের পেয়ে সমস্ত জড়তা কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। 'হোল্ড অন টাইট! হোল্ড অন টাইট! মেজর কলিশন কামিং!'

খপ্ করে রানার কনুই খামচে ধরল কাফম্যান, ব্যথায় উফ্ করে উঠল রানা। 'মি. রানা, বে-র ভেতর দিকে তাকান, কি ওটা?'

প্রথমে জিনিসটাকে চেনা গেল না। পানির তলা দিয়ে ছুটে আসছে, উঁচু পিঠ জেগে রয়েছে পানির ওপর। হাঙর নয়, তিমি নয়, তবে কি সাবমেরিন?

'আন্ডারওয়াটার স্পার!' ফিসফিস করে বলল রানা।

দুশো ফিট উঁচু আইসবার্গের প্রসারিত পায়ের পাতা বলা যেতে পারে, পানির তলা দিয়ে ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছে বে-তে। পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে এগিয়ে আসছে। আকৃতিটা আন্দাজ করার

চেষ্টা করল রানা, ডায়ামিটারে পঞ্চাশ ফিটের কম হবে না।

পায়ের পাতার পিছু পিছু আসছে শরীরটা। ব্রিজের লোকেরা রেইল আঁকড়ে ধরল। নিচে, ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলোও অবশিষ্ট রেইল ধরে তৈরি হলো আত্মরক্ষার জন্যে। রানার মাথা সামান্য একটু নড়ে উঠল, আকাশ থেকে কি যেন একটা পড়তে দেখল ও।

ছোটখাট একটা বাড়ি খসে পড়ল যেন। পড়ল নবাগত আইসবার্গের মাথার দিক থেকে। অথচ এই আইসবার্গের সাথে বাইশতলা এখনও ধাক্কা খায়নি। বে-র বাইরে, সরু ফাঁকটার কাছাকাছি পড়ল সেটা, মিনার আকৃতি নিয়ে আকাশের দিকে লাফ দিল পানি। 'খোদা!' আঁতকে উঠল নিয়াজ। 'ওটা গোস্ট বার্গ...'

তারমানে, গোটা পাহাড়টা, কয়েক মিলিয়ন টন বরফ, ধাক্কা লাগার মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। ঢাকা পড়ে যাবে বে, কবর হয়ে যাবে কিউটের। কাঠের মূর্তির মত অনড় দাঁড়িয়ে ধাক্কা লাগার অপেক্ষায় রয়েছে ওরা। প্রকৃতির খেলা, ওদের কোন ভূমিকা নেই। দুই আইসবার্গ পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাবে, ওরা শুধু যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ নির্বাক দর্শক হয়ে থাকবে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ক্যাপটেন এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল বাইশতলা, ওটার বিশালত্ব চাক্ষুষ করার সুযোগ মিলল। মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই দুই আইসবার্গ স্পর্শ করল পরস্পরকে।

সংঘর্ষের আওয়াজ শুনে মনে হলো কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। শক ওয়েভের ধাক্কায় যে যেখানে ছিল, ছিটকে পড়ল সবাই মেঝেতে। প্রথম ঝাঁকিতে সাড়ে ছয় হাজার টন কিউট লাফ দিয়ে উঠল যেন। জাহাজের প্রতিটি কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল, ঝন ঝন

শব্দে নাচতে শুরু করল পেয়ালা, বাসন, চামচ থেকে শুরু করে শাবল, কোদাল, ইত্যাদি সব। বন বন করে ঘুরতে শুরু করল কম্পাসের কাঁটা। ডেক থেকে ছিটকে পানিতে পড়ল তিনজন ক্রু, সাথে সাথে মারা গেল তারা। তারপর, হঠাৎ করেই, সব শব্দ থেমে গেল, স্থির হয়ে গেল জাহাজ।

ভৌতিক নিস্তব্ধতা নামল।

সংঘর্ষের আগেই বন্ধ করা হয়েছিল এঞ্জিন। কেউ কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ এক চুল নড়ল না পর্যন্ত। বে থেকে বেরুবার সরু পথের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। ফাঁকটার এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। বাইশতলার নিরেট পাঁচিল বন্ধ করে দিয়েছে সেটা। বে পরিণত হয়েছে খাঁড়িতে। যেন একটা বোতলের ভেতর আটকা পড়েছে ওরা, চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। ছোট একটা লেকে রয়েছে কিউট, যে লেক থেকে বেরুবার কোন পথ নেই। বিশাল বাহনের ভেতরে বন্দী ওরা, ভেসে চলেছে দিনে বিশ মাইল গতিতে।

সংঘর্ষ ঘটলেও, ধসে পড়েনি গোস্ট বার্গ।

রানাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। সবাই ওর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন মানুষের গলা শুনে ভারি অবাক হয়েছে।

‘আর কোন উপায় নেই, ক্যাপটেন,’ বলল রানা। ‘বার্গের সাথেই ভেসে যেতে হবে। কোন বিকল্প নেই।’

‘নেই,’ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। ‘শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া। অপেক্ষার শেষ হবে শালার আইসবার্গ মাথার ওপর ভেঙে পড়লে, তাই না?’

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ‘তাই।’

‘ওদের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে!’ আবার দমকা বাতাসের মত ব্রিজে ঢুকল জুনায়েভ। সন্ত্রস্ত, বিমূঢ় চেহারা, হাঁপাচ্ছে।

টুঁ-শব্দ না করে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল কর্নেল বলটুয়েভ, হাইড্রোফোন সেকশনে নিজে গিয়ে ব্যাপারটা জানবে।

কর্নেলকে ঢুকতে দেখে ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে মুখ তুলল অপারেটর।

‘জুনায়েভ বলল, তুমি নাকি আর কিছু শুনতে পাচ্ছ না? তোমার ইনস্ট্রুমেন্ট নষ্ট?’

‘না। ওদের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। কোন ইকো-ই আমরা পাচ্ছি না।’

‘কত দূরে?’

‘এক মাইল, কাছেও হতে পারে…’

‘দশ মিনিট আগেও তো তাই ছিল!’ জুনায়েভের দিকে কটমট করে তাকাল কর্নেল। ‘ব্যাপারটা কি? দশ মিনিট আগে এক মাইল দূরে ছিল কিউট। কয়েক সেকেন্ড আগে পর্যন্ত ওদের এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেছে। অথচ এখনও ওরা এক মাইল দূরে! কিভাবে সম্ভব? আমরা ভেসে আছি, ওরা দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছে। মাঝখানের দূরত্ব আরও কমে আসার কথা!’

‘কিন্তু ঘটনা সত্যি…’

‘হতে পারে না, টেকনিক্যালি ইমপসিবল!’ মারমুখো হয়ে উঠল কর্নেল।

‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার কাছেও বিদঘুটে লাগছে…’

বুকে হাত বেঁধে অগ্নিদৃষ্টি হানল কর্নেল। ‘এমন নয় যে আমরা

যেমন কারেন্টের সাথে ভেসে চলেছি, ওরাও তেমনি ভেসে চলেছে। তা যদি হত, দূরত্ব একই রকম থাকত, কমত না বা বাড়ত না। কিন্তু ওরা শুধু স্রোতের টানে চলছে না, আমরা ওদের এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছি!'

'জ্বী, পরিষ্কার,' আমতা আমতা করে বলল অপারেটর। 'এক মিনিট আগেও...'

'তাহলে ব্যাখ্যা করো!' মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। ভয়ে এক পা পিছিয়ে গেল অপারেটর।

'বুঝতে পারছি না, কি ব্যাখ্যা করব...'

সমস্ত রাগ আর উত্তেজনা নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল কর্নেল। অযোগ্য লোকদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় জানে সে, কিন্তু কারও বিচার করার সময় এটা নয়। 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা গরম কোরো না। তোমার যা কাজ করো তুমি, কানে প্লাগ ঢুকিয়ে বসে থাকো।' জুনায়েভের দিকে ফিরল সে। 'চেক করার আরও উপায় আছে। এতই যখন কাছে ওরা, একটা হেলিকপ্টার পাঠালেই তো হয়।' জুনায়েভ নির্দেশ পেয়ে চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল, 'পাইলটকে বলে দেবে কিউটকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তার ফেরার দরকার নেই।'

জোড়া লাগা দুই আইসবার্গের মাঝখানে, বিশাল বাহনের কোলে বসে রয়েছে কিউট। স্রোতের সাথে দক্ষিণ দিকে ভেসে চলেছে ওরা। কতক্ষণ, কত ঘণ্টা ধরে ভেসে চলেছে, কেউ বলতে পারবে না। বরফের খাঁচায় বন্দী লোকগুলোর সময় জানার কোন উপায় নেই।

প্রথমে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। এতই অবিশ্বাস্য, ক্যাপটেন গোল্ডম্যান বাধ্য হয়ে নির্দেশ দিলেন, জাহাজে যত ঘড়ি আছে সব চেক করে দেখতে হবে। হুকুম তামিল হলো। দেখা গেল, অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনা সত্যি। হাতঘড়ি, দেয়াল-ঘড়ি, টেবিল-ঘড়ি–সব বন্ধ হয়ে আছে। কারণটাও আন্দাজ করা গেল। দুই আইসবার্গ ধাক্কা খাওয়ার সময় যে শক ওয়েভ আর কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল, এ তারই ফলশ্রুতি–সব ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে। জাহাজের কোথাও আর খুঁজতে বাকি রাখা হলো না, যদি একটা সচল ঘড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

কাজেই সময়ের ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে কাজ চালাতে হলো। লগ বুকে লেখা হলো, ‘প্রায় উনিশশো ঘণ্টা…’ ‘সম্ভবত বাইশশো ঘণ্টা…’ এই রকম।

সময় জানতে না পারায় স্নায়ুর ওপর চাপ বাড়তে লাগল। ওদিকে মাথার ওপর ঝুঁকে আছে গোস্ট বার্গের চূড়া, লক্ষ-কোটি টন বরফ নিয়ে। যে-কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। যদি পড়ে, বাঁচার চিন্তা করা বাতুলতা। সাড়ে ছ’হাজার টনী কিউট চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। লোকজনের কথা না বলাই ভাল।

তার ওপর, কারও কিছু করার নেই। করার নেই, করার সাহসও নেই। প্রতি মুহূর্তের স্বাভাবিক সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ডেকে কিছু বরফ এখনও রয়েছে, কিন্তু ফেলার সাহস হলো না–ভয়, কোদাল বা শাবলের আওয়াজ যদি আকাশ ছোঁয়া গোস্ট বার্গকে স্পর্শ করে, যদি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গোস্ট বার্গ! রানা আর নিয়াজ প্রতিবেশী আইসবার্গে উঠে এক চক্কর ঘুরে আসার পর পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিল।

'লক্ষণ যা দেখছি, গোস্ট বার্গ বলেই মনে হয়,' আইসবার্গ থেকে ঘুরে আসার প্রস্তাব দিয়ে ক্যাপটেনকে বলেছিল রানা। 'চূড়া থেকে বড় একটা টুকরো খসে পড়ল। তবু চেক করে দেখা দরকার...'

দেখার পর আর কোন সন্দেহ থাকল না, গোস্ট বার্গই বটে; এত বড় এর আগে দেখেনি রানা। দুশো ফিট উঁচু পাঁচিলের উল্টো পিঠটা, যে পিঠটা সাগরের দিকে মুখ করে রয়েছে, ঠিক যেন আরব্য রজনীর কোন দৃশ্য। ওখানে পৌঁছুবার জন্যে বে-র সরু ফাঁক গলে ঢুকে পড়া আন্ডারওয়াটার স্পার পেরোতে হলো ওদেরকে। পাঁচিলের গোড়ায় এসে সরু একটা কার্নিস পাওয়া গেল, সেটা ধরে সাবধানে উঠল ওরা। তারপর একটা বাঁক নিয়ে থমকে দাঁড়াল, চোখ তুলে যা দেখল তাতে আতঙ্কে কথা সরল না মুখে। অসংখ্য বিশাল আকারের গুহা আর ফাটল আইসবার্গের গায়ে, অথচ জাহাজ থেকে দেখে মনে হয়েছিল নিরেট বরফের পাহাড়। সারি সারি স্তম্ভ দেখল ওরা, কোনটা পঞ্চাশ ফিট উঁচু, কোনটা একশো বা তারও বেশি; স্তম্ভগুলোর ওপর বসানো রয়েছে বরফের ভারী ছাদ। আর নিচে, সী লেভেল থেকে অনেক উঁচুতে, যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেখানে বিশাল একটা কুয়ো। পারে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকিয়েও কিছু দেখতে পাওয়া গেল না, অন্ধকার। তবে কান খাড়া করে ছলছল আওয়াজ শোনা গেল, বরফের গায়ে গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট আছাড় খাচ্ছে। গোস্ট বার্গ, অন্তত আধ মাইল লম্বা, নিরেট তো নয়ই, প্রায় সম্পূর্ণটাই ফাঁপা। ঘামতে শুরু করা জেলিগনাইটের মত, যে-কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে বিস্ফোরণ।

'ধাক্কা লাগার সময় ধসে পড়েনি কেন!' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

'এটাই তো বৈশিষ্ট্য। প্রচণ্ড ধকল সইতে পারে, আবার হঠাৎ সামান্য একটা শব্দেই হুড়মুড়...'

'যথেষ্ট দেখেছি, এবার চলো ফেরা যাক...'

'ইয়াল্লা, ওটা কি নিয়াজ?'

বিরাটকায় একটা স্তম্ভের মাথা থেকে কুয়াশা সরে গেছে, টাওয়ারের দুশো ফিট পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, আরও ওপর দিকটা কুয়াশায় ঢাকা। টাওয়ারটা চওড়া, ডায়ামিটারে একশো ফিটের কম না। গায়ে গরাদহীন জানালা, একটার ওপর আরেকটা, অনেকগুলো। জানালা না বলে গর্ত বলাই ভাল, টাওয়ারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা। সংখ্যায় ওগুলো এত বেশি, টাওয়ারটা এখনও কিভাবে খাড়া রয়েছে সেটাই একটা বিস্ময়। ওপরের অংশ থেকে সরে গেল কুয়াশা, স্তম্ভিত হয়ে ওরা দেখল টাওয়ারটা বিশাল একটা ঝুল-বরফের প্রসারিত বাহুর ভার বহন করছে। প্রকাণ্ড বাহু আইসবার্গের মূল পাঁচিলের পিছন দিক থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। রানা ঠিক বুঝতে পারল না, টাওয়ারটা কি শুধু বাহুর ভার বহন করছে, নাকি বাহু সহ গোটা পাঁচিলটার।

'এভাবে বেশিক্ষণ টিকবে না,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'চলো ফিরি।'

কি দেখেছে, মাত্র একজনকে বলল ওরা। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের সবাই জেনে ফেলল ব্যাপারটা। এরপর থেকে উত্তেজনা আর উদ্বেগ অসহ্য হয়ে উঠল। কারও কারও এমন অবস্থা দাঁড়াল, সন্দেহ হলো পাগল হয়ে যাবে। বাল্কহেডের সাথে

কারও যদি কনুই ঠুকে যায়, সঙ্গীরা তার দিকে এমনভাবে তাকায়, পারলে যেন খুন করে ফেলে। কারও খিদে পাচ্ছে না। চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে। কিছু করার না থাকায় স্নায়ুর ওপর চাপ আরও বাড়তে লাগল। আইসবার্গ প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে, সেই সাথে ধীরে ধীরে ঘুরছে স্রোতের টানে, অথচ কেউ কিছু অনুভব করছে না। এভাবে বেশিক্ষণ চলতে থাকলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে ওরা।

'বিস্ফোরকের ব্যাপারে আমরা এত আগ্রহী কেন?' রানার কেবিনে বসে রয়েছে ওরা, নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠলে জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

'আইসবার্গ থেকে যদি বেরুতে পারি, আরেকটা বিপদ দেখা দেবে,' বলল রানা। 'তখন আত্মরক্ষার জন্যে বিস্ফোরক লাগতে পারে। কিভাবে, কোথায়, কখন, আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। ক্যাপটেন গোল্ডম্যানের মত আশাবাদী নই আমি। ভেসে থাকা মাইন বা ওই ধরনের কিছুর কথা ভাবছি। কাফম্যানের সাথে আমার কথা হয়েছে।'

'তোমার কি মনে হয়, এই জোড়া লাগা আইসবার্গ থেকে উদ্ধার পাব?'

'যদি গোস্ট বার্গ ঘুরে আমাদের দক্ষিণে চলে যায়, তাহলে একটা আশা আছে,' বলল রানা। 'স্রোত ওটাকে টানবে, সেই টানে আবার সরে যেতেও পারে।'

বিনয় জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই কি তুমি হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেছ, রানা? গোস্ট বার্গে গিয়ে? গোল্ডম্যান তো বিশ্বাসই করছেন না।'

'কারণ নিয়াজ শুনতে পায়নি আওয়াজটা। শুধু শুনিনি, আমার

মনে হয় এক পলকের জন্যে দেখেওছি ওটাকে, তারপরই আবার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়।'

'তারমানে কর্নেল বলটু জানে আমরা কোথায়?'

'সেটাই সম্ভব।'

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার রাতে কোন এক সময় গোস্ট বার্গ বিচ্ছিন্ন হলো। লগে লেখা হলোঃ 'আন্দাজ বাইশশো ঘণ্টায়।' আইসবার্গের বিদায় পর্বটা দর্শনীয় কিছু হলো না। বজ্রপাতের মত একটা আওয়াজ শোনা গেল! শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল প্রত্যেকের বুক। ব্রিজের পিছনের পোস্ট থেকে কাফম্যান একা ব্যাপারটা ঘটতে দেখল। বে-তে ঢুকে আটকা পড়েছিল আন্ডারওয়াটার স্পার, বিকট শব্দের সাথে ভেঙে গেল সেটা। গোস্ট বার্গ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বে-র সামনে থেকে পিছু হটে দূরে সরে গেল ধীরে ধীরে। আন্ডারওয়াটার স্পারের বাকি অংশটা বে-র পানিতে বিপুল আলোড়ন তুলে পিছু নিল।

রানার সাথে ক্যাপটেন যখন ব্রিজে এলেন, পরিচিত দৃশ্যটা বদলে গেছে। জাহাজের পিছনে বে-র মুখ খুলে গেছে আবার। কুয়াশার ভেতর এখনও দেখা যাচ্ছে গোস্ট বার্গের কাঠামো, কিন্তু ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে সেটা। ক্যাপটেনের আচরণে এই প্রথম ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটল। যেচে পড়ে রানার সাথে করমর্দন করলেন তিনি।

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কারও কোন পরামর্শ না নিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'এঞ্জিন স্টার্ট! সাগরে বেরিয়ে যাব আমরা!'

দশ

কিউটের পিছনে পানিতে আলোড়ন তুলল প্রপেলার, সাদা ফেনার সাথে উথলে উঠল রাশ রাশ টুকরো বরফ। নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন, ধীরে ধীরে পিছু হটল জাহাজ। খানিকটা নেমে থেমে গেল আবার, এঞ্জিনের শক্তি বাড়ানো হলো। আরও জোরে ঘুরল প্রপেলার, এঞ্জিনের বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল ব্রিজ। উল্টোদিকে আবার গতি সঞ্চার হলো, ধীরে ধীরে বরফের ঢাল থেকে নেমে আসছে আইসব্রেকার।

সবশেষে পানিতে নামল বো, ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠল পানি। বে-টা এতই ছোট, জাহাজ ঘোরাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পিছু হটে সরু ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে হবে।

বে-র দুই বাহুর মাঝখানে পৌঁছে গেল কিউট, কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই ফাঁকটা গলে সাগরে পড়ল ওরা। ডেক কাঁপছে, রেইল ধরে বো-র দিকে এগোল রানা। মাথার ওপর আপাতত কোন কুয়াশা নেই। চাঁদের আলোয় ভাসমান বরফের টুকরো দেখা গেল পানিতে। ধীরে ধীরে জাহাজ ঘুরিয়ে নিলেন ক্যাপটেন। সামনে ঘন কুয়াশা রয়েছে, আধ মাইল দূরে। রানার পাশে বো-র কাছে এসে দাঁড়াল নিয়াজ। 'এই জেদের কোন মানে হয়? এখনও এগোচ্ছি, বার্গের সাথে থাকলেও এগোতাম। কাফম্যানকেও বিরক্ত মনে হলো। আচ্ছা, এই আলোক সজ্জার কি দরকার ছিল বলতে পারো?'

ক্যাপটেনের নির্দেশে জাহাজের সব ক'টা আলো জ্বেলে দেয়া হয়েছে। পোর্ট, স্টারবোর্ড, আর বো-র দিকে সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো ফেলা হয়েছে। ক্যাপটেনের ধারণা, এভাবে আলো জ্বেলে এগোলে, তার সাথে যদি অবিরাম ফগ-হর্ণ বাজতে থাকে, রুশ জাহাজগুলো ধাক্কা দেয়ার কোন অজুহাত খুঁজে পাবে না।

'কিউটে মেরিলিন চার্ট আর ইভেনকো রয়েছে, আর কোন অজুহাত দরকার আছে ওদের? যাই ঘটুক না কেন, রিপোর্ট করার উপায় নেই যখন?'

কিন্তু রানার কথা কানে তোলেননি গোল্ডম্যান। তাঁর যুক্তি, অন্ধকারে রুশ জাহাজগুলোকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলে পরে কর্নেল বলটুয়েভ বলার সুযোগ পাবে, সংঘর্ষের জন্যে আমেরিকানরাই দায়ী, কুয়াশার জন্যে কিউটকে তারা দেখতে পায়নি।

চোখে নাইট-গ্লাস তুলে দূরে তাকাল রানা।

'কিছু দেখছ?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল নিয়াজ।

'শুধু পানি। আর কুয়াশা।'

'কিছু দেখছেন?' ব্রিজ থেকে নিঃশব্দে নেমে এসে রানার আরেক পাশে দাঁড়াল কাফম্যান। 'আপনার যা চোখ, আবার মাস্তুলের ওপর উঠলে পারতেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে মাস্তুলের দিকে তাকাল রানা। আশি ফুট উঁচুতে, ক্রস-ট্রীর ওপর একজন বসে রয়েছে, ফার হুডের তলায় হেডসেট। ক্যাপটেনের নির্দেশে ওখানে উঠতে হয়েছে বেচারাকে। কিউটের সামনে কোন বাধা দেখলে সাবধান করবে। 'না, ধন্যবাদ। আবার! তাছাড়া, কুয়াশার ভেতর দেখার আছেটা কি?'

‘স্টার্নের কাছে, স্টারবোর্ড সাইডে কারলি ফ্লোট আছে,’ নিচু গলায় বলল কাফম্যান। ‘এক্সপ্লোসিভ কেবিনের পাশেই। চাবিটা মি. মুখার্জিকে দিয়ে রেখেছি।’

‘ধন্যবাদ।’

‘সাহায্যের দরকার হলে, হিগিন আছে,’ গলা আরও খাদে নামিয়ে বলল ক্যাফম্যান। ‘সবাই মিলে লঞ্চটাকে নামাতে পারব।’

‘হিগিন?’

‘ফ্লোটের কাছে লুক-আউট পয়েন্টে ডিউটি দিচ্ছে।’

‘ঠিক আছে।’

‘আমাকে বলবেন, ঠিক কি করবেন বলে ভাবছেন আপনি, মি. রানা?’

‘ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব,’ পরিষ্কার করে কিছু বলল না রানা।

‘ক্যাপটেন এখনও কিছু জানেন না, জানলে আমার চাকরি নট হয়ে যাবে,’ রানার কানে কানে বলল কাফম্যান।

‘আইসবার্গ অ্যালিতে মরার চেয়ে বেকার হয়ে বেঁচে থাকা ভাল নয়?’

‘কিউট আলাদা হয়ে যাচ্ছে,’ বলল কর্নেল। ‘পাইলটের তোলা ছবিতে যে আইসবার্গটার কোলে উঠে পড়েছিল, সেটা থেকে নেমে আসছে।’

রিগার ব্রিজে, রাডারস্কোপ-এর হুডের সামনে ঝুঁকে রয়েছে বলটুয়েভ, স্কোপের সবুজাভ আভায় উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে তার মুখ। কামানো মাথাটাও সবুজ রঙে চকচক করছে।

‘কত দূরে?’ অস্থিরতা চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল জুনায়েভ।

হুড থেকে মুখ তুলে ব্রিজের অপর প্রান্তে তাকাল বলটুয়েভ। তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন ট্রাভকিন, হাত দুটো পিছনে এক হয়ে আছে, সারা শরীর আড়ষ্ট। ‘এবার আপনি এঞ্জিন স্টার্ট দিতে পারেন, ক্যাপটেন,’ হাঁক ছাড়ল কর্নেল। ‘এখন থেকে রাডারের সাহায্যে নজর রাখব ওটার ওপর।’ এবার হুডের সামনে ঝুঁকে জুনায়েভের প্রশ্নের উত্তর দিল, ‘মাঝরাতের মধ্যে—আশা করি মাঝরাতের মধ্যেই সমস্ত ঝামেলা চুকে যাবে।’

আইসবার্গ অ্যালি ধরে দক্ষিণ দিকে চলেছে কিউট। ঠাণ্ডা দুধের মত পানি কাটছে বো, হাফ পাওয়ারে চালু রয়েছে এঞ্জিন। জাহাজের প্রতিটি আলো জ্বলছে। আরও একটা সুবিধে করে দেয়া হয়েছে কর্নেল বলটুয়েভকে, কিউটের শক্তিশালী ফগহর্ন করুণ সুরে বাজছে বিরতিহীন।

হর্নের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে শুনে চিন্তিত হলো রানা। তারমানে কুয়াশার ভেতর নিশ্চয়ই কোথাও আইসবার্গ আছে।

নির্দয় ঠাণ্ডার মধ্যে বো-র কাছে দাঁড়িয়ে আছে চারজন। মাঝে মধ্যে লুক-আউট পয়েন্টগুলোর কাছ থেকে ঘুরে আসছে তিনজন, শুধু রানা নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। চোখে নাইট-গ্লাস, হাত দুটো ব্যথা হয়ে গেল। পিছনে পায়ের আওয়াজ।

‘আপনার কফি, মি. রানা।’

পিছনে হিগিনকে নিয়ে আবার হাজির হলো কাফম্যান। ফ্লাস্ক থেকে অ্যালুমিনিয়ামের মগে তরল আগুনের মত কফি ঢালল

হিগিন। তাড়াতাড়ি চুমুক দিল রানা, এরইমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। হিগিনকে তার পোস্টে পাঠিয়ে দিল কাফম্যান। নিয়াজকে কোথাও দেখা গেল না। 'ক্যাপটেনের সাথে কথা বলে এলাম,' বলল কাফম্যান। 'বললেন, ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন তিনি।'

'তবু ভাল যে সন্তুষ্ট একজনকে পাওয়া গেল।'

'যাই বলুন, বিপদের কোন আভাস এখনও...'

'সব বিপদই কি আগাম নোটিশ দিয়ে আসে?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল রানা। কফি শেষ করে কাপটা কাফম্যানের হাতে ধরিয়ে দিল ও, নাইট-গ্লাস তুলল চোখে। লেন্সে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা করছে চোখ। সাগরের একধারে সরু একটা চ্যানেল দেখা গেল, চাঁদের আলোয় সম্পূর্ণ সমতল আর শান্ত, প্রায় এক মাইল লম্বা। দু'দিকে ভাসমান বরফের টুকরো গিজগিজ করছে। চ্যানেলের শেষ মাথাটা ঢাকা পড়ে আছে ঘন কুয়াশায়। পোর্ট সাইডে প্রকাণ্ড একটা আইসবার্গ, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। মাথার দিকে কুয়াশা নেই, টেবিলের মত সমতল ছাদ। স্টারবোর্ডের দিকে শুধু ভারী কুয়াশা, সাদাটে মেঘের মত আকাশ থেকে সাগর পর্যন্ত ঝুলে আছে, লম্বায় চ্যানেলটাকে ছাড়িয়ে গেছে।

রানা সেদিকে নাইট-গ্লাস ঘোরাতে কাফম্যান বলল, 'ওদিকে কুয়াশা ছাড়া দেখার কিছু নেই।'

'রেডিও-জ্যামিং কি আগের মতই স্ট্রং?'

'বেশি।'

'অর্থাৎ উৎসের খুব কাছে চলে এসেছি আমরা।'

সামনেটা বোতলের ঘাড়ের মত সরু—চ্যানেলের একদিকে সমতল ছাদ নিয়ে দৈত্যাকৃতি আইসবার্গ, আরেক দিকে গাঢ়

কুয়াশার নিশ্ছিদ্র স্তর। কোর্স সামান্য একটু বদলে দুই বিপদের মাঝখানে থাকার চেষ্টা করল জাহাজ। বিনয়কে নিয়ে বো-র কাছে ফিরে এল নিয়াজ। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল বিনয়, শরীর গরম রাখার চেষ্টা। দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। ব্রিজে ঢুকল কাফম্যান। রানার দিকে তাকিয়ে আছে নিয়াজ। ধীরে ধীরে নাইট-গ্লাস ঘুরিয়ে আবার স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল রানা। ওদিকে সিকি মাইলের মধ্যে চলে এসেছে কুয়াশা। বোতলের গলায় যখন ঢুকবে কিউট, কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাবে ওরা।

'কি ওটা?' আঁতকে উঠল নিয়াজ। 'স্টারবোর্ডের দিকে, অনেকটা দক্ষিণে?'

সচল পাঁচিলের মত জিনিসটা, কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। নিয়াজ বলার আগেই ওটাকে দেখতে পেয়েছে রানা। পরিচিত শত্রু, আগের সেই গোস্ট বার্গটা।

বোতলের গলায় ঢুকে পড়েছে কিউট। পোর্ট বো-র দিকে এগিয়ে আসছে সমতল ছাদ নিয়ে আরেক দৈত্য। কুয়াশার ঘন স্তরের দিকে তাকাল রানা। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ও। কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এল রিগার বো, তেড়ে এল ওদের দিকে যুদ্ধ-জাহাজের মত।

'আমেরিকান জাহাজটা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে—আমাদের ডান দিকের কোর্স ধরে...'

'কাজেই রেডি হোন,' ট্রাভকিনকে নির্দেশ দিল কর্নেল বলটুয়েভ।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে রিগা। ঝুঁকে আবার রাডার স্কোপে চোখ রাখল ট্রাভকিন। কিউটের এগিয়ে আসা লক্ষ করছে সে। সময়ের নিখুঁত হিসেব দরকার হবে। ঠিক মুহূর্তটিতে কুয়াশা থেকে বেরুতে হবে জাহাজ নিয়ে, তা না হলে ব্যর্থ হবে সে। 'কোর্স ঠিক রাখো,' হেলমসম্যানকে নির্দেশ দিল।

মন্থরবেগে এগোচ্ছে রিগা। সময়ের হিসেবে, কুয়াশা থেকে বেরুলেই সামনে পড়বে কিউট। রাডারস্কোপে ঝুঁকে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যথা হয়ে গেল ট্রাভকিনের, দরদর করে ঘামছে সে। পিছনে কর্নেল বলটুয়েভের উপস্থিতি আড়ষ্ট করে তুলছে তাকে।

'আমি চাই কিউটের ঠিক মাঝখানে গুঁতো মারবে রিগা,' ঢালাও হুকুম দিল কর্নেল।

রাডারস্কোপে ট্রাভকিন দেখল, কুয়াশা আর আইসবার্গের মাঝখানে, সরু বোতলের গলায় ঢুকছে কিউট। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল কর্নেল।

'জাহাজ খোঁড়াচ্ছে কেন?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল সে। 'আরেকটু জোরে ছোটাতে পারেন না?'

'কুয়াশা থেকে আগেভাগে বেরুলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে,' ভারী গলায় বলল ক্যাপটেন। 'আপনি কি তাই চান?'

অন্ধকারে এগোচ্ছে রিগা, কোন আলো জ্বালা হয়নি। কুয়াশা চুইয়ে ক্ষীণ যে-টুকু চাঁদের আলো নামছে তাতেই সামনেটা খানিকদূর দেখতে পাচ্ছে বলটুয়েভ। এঞ্জিনের তেমন কোন আওয়াজ নেই, মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। সাগর সম্পূর্ণ শান্ত।

'স্পীড যা আছে তাই থাক,' নির্দেশ দিল ট্রাভকিন।

'এভাবে কতক্ষণ?' জানতে চাইল কর্নেল।

‘যতক্ষণ দরকার।’

চেহারায় আক্রোশ ফুটে উঠলেও চুপ করে থাকল কর্নেল। নেভিগেশন সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই তার। অস্থিরতা বোধ করার কারণ, তার ইচ্ছে প্রথমবারেই ধাক্কাটা লাগা চাই। ধাক্কা লাগলে কি ঘটবে, কল্পনার চোখে দেখার চেষ্টা করল সে। ষোলো হাজার টন ভার নিয়ে কিউটের ওপর চড়াও হবে রিগা। রিগার বাঁ দিকে থাকবে কিউটের বিচ্ছিন্ন স্টার্ন, ডান দিকে তোবড়ানো বো। কোন্‌টা আগে ডুববে? কিউটের পিছনটা, না সামনেটা?

‘কর্নেল! ব্রিজের পিছনে চলে যান! শক্ত করে রেইল ধরে থাকুন!’

ক্যাপটেনের কথামত তাই করল কর্নেল। হেলমসম্যান, কর্নেলের নিজের লোক, আরও জোরে আঁকড়ে ধরল হুইল। ব্রিজের সামনে কুয়াশা, সেদিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল বলটুয়েভ। কুয়াশা পাতলা হয়ে আসছে দেখলেই বুঝতে হবে সামনে কিউট আছে। রিগার একেবারে বো-র সামনে দেখা যাবে ওটাকে। ভাবল, বানচোত ট্রাভকিন স্পীড বাড়ায় না কেন?

রাডারস্কোপের সামনে থেকে সরে এল ট্রাভকিন, শক্ত হাতে টেলিগ্রাফের হাতল ধরল। হাফ স্পীডের নির্দেশ দিল সে। তারপরই আবার ছুটে গেল স্কোপের দিকে। ‘কোর্স ঠিক রাখো।’

জানালার সামনে দিয়ে ম্লান একটু আলো সরে গেল।

এঞ্জিনের আওয়াজ হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় কুয়াশার ভেতর একটা আলোড়ন উঠল। ঘামের ধারা চোখে নেমে আসছিল, দ্রুত হাত ঝাপটা দিয়ে সেটা মুছল কর্নেল। কিউটের ফগহর্নের আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে এখন।

সরাসরি সামনের দিক থেকে আসছে।

রাডারস্কোপে চোখ রেখে নিঃশব্দে বিড়বিড় করছে ক্যাপটেন ট্রাভকিন। অকস্মাৎ সামনে থেকে উঠে গেল কুয়াশার পর্দা।

চাঁদের আলোয় ভেসে গেল ব্রিজ। নাক বরাবর সামনে চোখ ধাঁধানো আলো। কিউটা।

প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো রিগা, আকস্মিক গতি পেয়ে ছুটল। আইসব্রেকারের খোল দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। দু'হাতে রাডারস্কোপ ধরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ট্রাভকিন, চোখ দুটো বিস্ফারিত। সময়ের হিসেবে তার কোন ভুল হয়নি।

স্পীড বাড়াও! স্পীড বাড়াও!–নিঃশব্দে আবেদন জানাচ্ছে ট্রাভকিন। ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল সে। আশা, কিউটের ক্যাপটেন তার আকুল আবেদনে সাড়া দেবে।–স্পীড বাড়াও! সরে যাও সামনে থেকে! প্লীজ, প্লীজ!

স্পীড আগেই বাড়িয়ে দিয়েছেন ক্যাপটেন গোল্ডম্যান। কুয়াশা থেকে রিগাকে বেরুতে দেখেই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রিগা সোজা ছুটে আসছে, সরাসরি আঘাত করবে কিউটের মাঝখানে। ব্রিজের পিছন থেকে দৃশ্যটা ভালভাবে দেখতে না পেলেও উল্লাসে উত্তেজনায় ছটফট করছে বলটুয়েভ।

একেবারে শেষ মুহূর্তে মনে হলো, কিউট রক্ষা পেল না। আইসব্রেকারের মাস্তুল রিগার সামনে দেখা গেল, ব্রিজ ছাড়িয়ে গেছে। কোর্স না বদলে রিগার পথেই থাকল কিউট, গতি আগের চেয়ে বেড়ে গেছে।

'ফুল স্পীড! ফুল স্পীড!' ভয়েস পাইপে অনবরত চিৎকার করছেন গোল্ডম্যান।

কিউটের মাঝখানে নয়, পিছনে আঘাত করতে যাচ্ছে রিগা। কিউটকে এই স্পীডে পাবে, কর্নেল আশা করেনি। আইসব্রেকারের পিছনে উথলে ওঠা পানির দিকে বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল সে। চোখের পলকে রিগার বো-র সামনে থেকে স্যাঁৎ করে সরে গেল কিউটের স্টার্ন। এক ছুটে স্টারবোর্ড সাইডে চলে এল ট্রাভকিন। রেইল ধরে ঝুঁকে পড়ল সে।

ব্রিজের মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল বলটুয়েভ, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে তার। 'আপনি একটা অকর্মার ধাড়ি! এরপর আমি কমান্ডে থাকব।' রাগে দিশেহারা, কি করবে বুঝতে পারছে না। পায়চারি শুরু করল সে, তারপর ছুটে এল ক্যাপটেনের দিকে–মারবে।

প্রকাণ্ড দেহটাকে দু'হাত দিয়ে ঠেকাল ট্রাভকিন, তারপর জোরাল একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল এক পাশে। একহারা লোকটার গায়ের জোর দেখে তাজ্জব বনে গেল কর্নেল।

দাঁতে দাঁত চেপে গাল পাড়ল ট্রাভকিন, 'আপনি একটা মাথামোটা আহাম্মক–দেখছেন না, আইসবার্গে ধাক্কা খাচ্ছি!'

ঝট্ করে সামনে তাকাল বলটুয়েভ। আতঙ্কে দু'পা পিছিয়ে এল সে। জানালা জুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে সমতল ছাদ নিয়ে একটা দৈত্যাকৃতি আইসবার্গ।

ভরাডুবি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার, বুঝতে পেরে দু'হাতে মুখ ঢাকল বলটুয়েভ।

কিউটের স্টার্নে ছিল রানা।

মনে হলো সংঘর্ষ ঠেকাবার উপায় নেই। শেষ মুহূর্তে ধারণা হলো, রিগার বো কিউটের প্রপেলার গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। পরমুহূর্তে

দেখা গেল, প্রপেলারের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বো, মাত্র কয়েক গজের জন্যে মিস করল টার্গেট।

‘বার্গের সাথে ধাক্কা খাবে,’ পাশ থেকে বিড়বিড় করে উঠল নিয়াজ।

‘এসো, প্রার্থনা করি।’

স্টার্নে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল ওরা। শেষ রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল রিগার ক্যাপটেন, রিসার্চ শিপের পিছনে টগবগ করে ফুটতে শুরু করল পানি। ঘুরে যাচ্ছে জাহাজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্মুখগতি রোধ করা সম্ভব হলো না। এই লাগল, এই লাগল ভাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেন অলৌকিক ভাবে রিগার বো সম্পূর্ণ ঘুরে যাবার সময় পেল, সংঘর্ষ হলো না।

তারমানে বিপদ কাটল না। গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা। নিয়াজ, বিনয়, আর হিগিনকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে সোজা ব্রিজে উঠে এল ও।

পিছনের জানালার কাছ থেকে ঘাড় ফেরালেন গোল্ডম্যান। ‘আপনার কথাই ঠিক, মি. রানা। রিগা আমাদের ডোবাবার চেষ্টা করল।’

‘আবার করবে। দৌড় প্রতিযোগিতায় আপনি ওদের সাথে পারবেন না।’

‘প্রশ্নই ওঠে না।’ ম্লান দেখাল ক্যাপটেনকে। ‘কিউটের টপ স্পীড মাত্র ষোলো নট।’

‘কাজেই যদি সম্ভব হয়, ওটাকে থামাতে হবে, ঠিক? কিউট, ক্রু, ইভেনকো রুস্তভ, আর ডকুমেন্টের কথা ভাবতে হবে আপনাকে।’

‘এক্সপ্লোসিভের ব্যাপারটা কাফম্যান আপনাকে জানিয়েছে?’ হঠাৎ জানতে চাইলেন গোল্ডম্যান।

চোখে অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, কথা বলল না।

‘আপনার ধারণা, আমার জাহাজে কি ঘটছে না ঘটছে আমি জানি না, মি. রানা?’

‘রিগাকে থামাতে হবে, ক্যাপটেন,’ আবার বলল রানা।

‘যদি হয়, আমি হয়তো ভুল করে লগ বুকে ব্যাপারটা লিখব না।’ রানার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপটেন। তারপর মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন, ‘স্টপ হার!’

কারলি ফ্লোট একটা ভেলা, কোন কারণে জাহাজ থেকে সবাইকে নেমে পড়তে হলে পানিতে ভাসানো হয়। একশো পাউন্ড জেলিগনাইট, ডেটোনেশনের জন্যে তার জোড়া লাগিয়ে তোলা হলো ফ্লোটে। জায়গা মত ফিট করা হয়েছে টাইমার মেকানিজম, বিস্ফোরণের জন্যে দশ মিনিট মেয়াদ বেঁধে দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে–তবে বন্ধ রাখা হয়েছে ঘড়ি, চালু করা হয়নি। ফ্লোটটাকে এখন বিস্ফোরণোন্মুখ মাইন বলা যেতে পারে।

পানিতে লঞ্চ নামাবার সময় জাহাজের গতি কমাতে হলো। সিদ্ধান্তটা স্নায়ু বিদীর্ণ করার জন্যে যথেষ্ট। কারণ, এখনও অনেকটা দূরে হলেও, আবার ধাওয়া করে ওদের ধরতে আসছে রিগা।

মাঝখানের দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে এমনিতেই কম ছিল, এখন আবার স্পীড কমাতে হলো কিউটকে।

শুধু যে পিছনে বিপদ তাই নয়, ব্রিজ থেকে সামনে তাকালেও

মনে ভয় ধরে যায়। স্টারবোর্ডের দিকে এখনও গাঢ় হয়ে রয়েছে কুয়াশার স্তর, আধ মাইল দূরের গোস্ট বার্গটাকে আবছা করে রেখেছে। পোর্ট সাইড আরও ভয়াবহ দৃশ্য উপহার দিল, সার সার আইসবার্গ আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে—পরিষ্কার পানি নিয়ে লম্বা হয়ে থাকা চ্যানেলটাকে সরু করে রেখেছে। আরও সামনে, নাক বরাবর, চ্যানেলের দুই পাশে, বিশাল দুই আইসবার্গ টাওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দলবদ্ধ আইসবার্গগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে হবে গোল্ডম্যানকে।

'ওভারটেক করতে কি রকম সময় নেবে রিগা?' কাফম্যানকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দশ মিনিট—আন্দাজে বলছি।'

গম্ভীর গলায় নিয়াজ বলল, 'আমার আন্দাজ পাঁচ মিনিট।' স্টারবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল সে। 'ক্যাপটেন কোর্স বদল করছেন—লাইন দিয়ে দাঁড়ানো বার্গগুলোর কাছে সরে যাচ্ছে জাহাজ।'

'তাই যেতে বলেছি,' বলল রানা। 'কিউট আর গোস্ট বার্গের মাঝখানে যতটা সম্ভব চওড়া চ্যানেল থাকা দরকার।'

'যাতে রিগা চওড়া অংশটা বেছে নিতে বাধ্য হয়? ক্যাপটেনের কি মাথা খারাপ হয়েছে…!'

'তাহলে আমারও মাথা খারাপ হয়েছে। এসো, লঞ্চে নামা যাক।'

ডেভিট কেব্‌লে ঝুলছে লঞ্চ। একজন ক্রুকে নিয়ে পাশেই অপেক্ষা করছে হিগিন। রানার পিছু পিছু একে একে লঞ্চে চড়ল বিনয় আর নিয়াজ।

‘মি. রানা, এখনও আপনি বলেননি ঠিক কি করার কথা ভাবছেন। রিগার বো-র তলায় ফাটাবেন ওগুলো? কিন্তু তা...’

‘তা সম্ভব নয়,’ কাফম্যানকে বলল রানা। ‘ফুল স্পীডে আসছে রিগা, বো-র তলায় জেলিগনাইট রেখে আসবে কে? ফর গডস সেক, দেরি না করে পানিতে নামান আমাদের! এভাবে সময় নষ্ট করলে মরতে হবে, মারতে হবে না।’

সময় কম। অথচ কাজগুলো জটিল, সময়সাপেক্ষ, ঝুঁকিপূর্ণ। উইঞ্চ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে পানির দিকে নিচু করা হলো লঞ্চ। সচল জাহাজ থেকে সাবধানে নামতে হবে পানিতে। কেব্‌লের শেষ মাথায়, শূন্যে, জাহাজের পাশে, ঝুলতে লাগল লঞ্চ। নামছে, কিন্তু খুব ধীরে।

ওদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে রিগা। কুয়াশার ভেতর ঝাপসা, বিশাল একটা অশুভ আকৃতি। ফুল স্পীডে আসছে, এঞ্জিনের আওয়াজ পেল ওরা। তাগাদার ওপর তাগাদা দিচ্ছে রানা, ‘তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!’

পানিতে নেমে দুলতে লাগল লঞ্চ, জাহাজের বো থেকে ঢেউ উঠছে।

এবার ফ্লোটটাকে নামাতে হবে। মুখ তুলে তাকাল ওরা, এরই মধ্যে নামতে শুরু করেছে ফ্লোট। সবাই জানে, নামাবার সময় ফ্লোট যদি জাহাজের গায়ে বাড়ি খায়, জেলিগনাইট বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনা কম—কম, তারমানে সম্ভাবনা আছে। এ-ধরনের দুর্ঘটনা একেবারে যে ঘটে না তাও নয়।

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নেমে আসছে ফ্লোট। জাহাজের উঁচু কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্রুরা, একটু একটু করে রশি ছাড়ছে

তারা। হঠাৎ একজনের হাত থেকে ফসকে গেল রশি। কাত হয়ে পড়ল ফ্লোট।

‘ব্যাটা বলটুর লোক!’ প্রচণ্ড রাগে প্রলাপ বকল নিয়াজ। ‘আমাদের মারতে চায়।’

চরম বিপদের মধ্যেও মানুষ হাসতে পারে, প্রমাণ করল রানা।

কাত হয়ে গিয়ে দুলতে লাগল ফ্লোট, জাহাজের খোলে দড়াম দড়াম বাড়ি খেলো। যে-কোন মুহূর্তে বিপজ্জনক কার্গো ছিটকে পানিতে পড়তে পারে। লঞ্চে, ওদের মাথার ওপর পড়লেই বা কার কি করার আছে!

ধৈর্য হারিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। রিগা কোর্স বদলে চ্যানেলের চওড়া অংশে সরে যাচ্ছে। কিউটের স্টারবোর্ড সাইডে পজিশন নেবে ওটা। ‘খোদার দোহাই, তাড়াতাড়ি করো!’

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো, চোখের পলকে। শূন্য থেকে খসে পড়ল ফ্লোট। সরাসরি ওদের মাথার ওপর নামছে।

মাথা থেকে তিন ফিট ওপরে ঝাঁকি খেয়ে থামল সেটা, এখনও কাত হয়ে আছে। এরপর নামার গতি আগের মত শ্লথ, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে। ধীরে ধীরে সিধে হলো আবার।

নিরাপদেই নেমে এল ফ্লোট। ঘড়ি চালু করল বিনয়। গোস্ট বার্গ যখন ধাক্কা দেয়, ঘড়িটা বন্ধ ছিল, সেজন্যেই বোধহয় নষ্ট হয়নি ওটা। লঞ্চের সাথে আগেই বাঁধা হয়েছে ফ্লোটটাকে। এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, হুইল ধরে কাফম্যানের উদ্দেশে চিৎকার করল। উইঞ্চ কেব্‌ল্‌ খুলে নেয়া হলো। দ্রুত এগোল লঞ্চ, ক্রমশ দূরে সরে এল জাহাজের কাছ থেকে, হেলেদুলে পিছু নিল ফ্লোট।

পিছন ফিরে রুশ রিসার্চ শিপের দিকে তাকাল নিয়াজ।

‘আমরা বোধহয় দেরি করে ফেলেছি!’

শান্ত সাগর, সগর্জনে ছুটল লঞ্চ, সোজা গোস্ট বার্গের দিকে যাচ্ছে। কিউটের পথ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ওরা, এগোচ্ছে রিগার সামনের পথ লক্ষ্য করে। ভাগ ভাগ হয়ে যাচ্ছে কুয়াশা, ওদের টার্গেট গোস্ট বার্গের খাড়া পাঁচিল ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো। বিশাল একটা মহাদেশের মত তার বিস্তার।

বার্গের আরও কাছাকাছি পৌঁছে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল রানা। বার্গের গোড়ায়, ভিতের কাছে বড়সড় একটা গুহা রয়েছে। গুহার ভেতরটা অন্ধকার, চাঁদের আলো ঢুকছে না। আলো ঢুকছে না, কিন্তু তীব্রগতি স্রোত তুমুল শব্দে ভেতরে ঢুকছে। রানা উপলব্ধি করল বার্গের ভেতর, পেটের মাঝখানে একটা লেক তৈরি হয়েছে। তড়িঘড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও।

‘আরও কাছাকাছি যাব আমরা–ফ্লোটটাকে ছেড়ে দেব আইসশেলফের কিনারায়।’

রানার চেয়ে আরও জোরে চিৎকার করল নিয়াজ, ‘অনেক দূরে চলে এসেছি, ফিরব কিভাবে? কিউটকে যদি ধরতে না পারি?’

‘সে ঝুঁকি নিতেই হবে,’ বলল রানা। ‘টানেলটা দেখছ? মুখে ছেড়ে দেব ফ্লোটটা। বার্গের ভেতর ঢুকে যেখানে খুশি ফাটুক।’

রানার প্ল্যানটা সাদামাঠা, কাজ হলেও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। দু’দু’বার ধসে পড়া থেকে বেঁচে গেছে গোস্ট বার্গ। একবার দ্বিতীয় বার্গের সথে জোড়া লাগার সময়, আরেকবার বিচ্ছিন্ন হবার সময়। তিন বারের বার হয়তো সত্যি ওটা ভেঙে পড়বে। জেলিগনাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তৃতীয় ধাক্কাটা দিয়ে দেখতে চায় রানা। যদি ধসে, রিগার সামনে বন্ধ হয়ে যাবে

চ্যানেল।

‘মাসুদ রানা, তোমার সলিল সমাধি ঠেকায় কে!’ উল্লসিত দানবের মত রিগার ব্রিজে লাফ-ঝাঁপ মারছে কর্নেল বলটুয়েভ। ‘ব্যাটাচ্ছেলের সৌভাগ্যই বলতে হবে, কফিন হিসেবে সাড়ে ছ’হাজার টন লোহা-লক্কড় পাচ্ছে! জোড়াও মিলেছে ভাল—ইভেনকো রুস্তভ সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রু, মাসুদ রানা ইসরায়েলের! যাও, একসাথে ঠাণ্ডা করবে!’

রাডারস্কোপের কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে উন্মাদটার দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকাল ক্যাপটেন ট্রাভকিন।

‘মাঝখানে দূরত্ব কমে আসছে!’ আনন্দে ব্রিজের মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। পরমুহূর্তে চোখ পাকিয়ে তাকাল ট্রাভকিনের দিকে। ‘সময় ঘনিয়ে এলে আমি নিজে হুইল ধরব!’ ক্লিয়ারভিশন প্যানেলে মুখ চেপে ধরল সে। ঝাপসা কুয়াশার ভেতর কিউটের কাঠামো দেখা গেল। ‘তুমি টেলিগ্রাফের চার্জে থাকবে, স্পীড কন্ট্রোল করবে,’ জুনায়েভকে বলল সে।

‘চ্যানেলটা লক্ষ করছেন?’ জিজ্ঞেস করল ট্রাভকিন। ‘একেবারে সরু। জাহাজ নড়াচড়ার জায়গা পাবে কি না সন্দেহ।’ প্রতি মুহূর্তে পোর্ট, স্টারবোর্ড, আর স্টার্নের দিকে ঘন ঘন চোখ বুলাচ্ছে ক্যাপটেন। স্টারবোর্ডের দিকে বিশাল একটা আইসবার্গ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে কুয়াশা থেকে, রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছে সে। তবু তো ট্রাভকিন জানে না, ওটা একটা গোস্ট বার্গ, ভেতরটা ফাঁপা—যে-কোনো মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। হঠাৎ কাঁপা গলায় বলল সে, ‘একটা লঞ্চ! কিউট থেকে

রওনা হলো! আমাদের সামনে দিয়ে চ্যানেল ক্রস করছে!'

'করুক! আপনাকে ও নিয়ে ভাবতে হবে না। স্পীড বাড়ান!'

'কি বলছেন! সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে! বুঝতে পারছেন না, আইসবার্গটার খুব কাছে চলে যাচ্ছি আমরা!'

'ফুল পাওয়ার!' ব্রিজে যেন বজ্রপাত ঘটল। জুনায়েভের দিকে মারমুখো হয়ে এক পা এগোল বলটুয়েভ। 'ফুল পাওয়ার!'

এগারো

ওদের মাথার ওপর বরফ-প্রাচীর খাড়াভাবে উঠে গেছে। সহস্র বরফ টুকরোর মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে লঞ্চ। সামনেই আইসশেলফ, ওখানে গোস্ট বার্গের গোড়া আলিঙ্গন করে আছে সাগর। স্পীড কমিয়ে দিল রানা, ধীরে ধীরে থেমে গেল লঞ্চ। ছোট বড় বরফ টুকরোর মাঝখানে দুলতে লাগল ওরা। ওদের বিশ গজ দক্ষিণে বিশাল গুহাটা, তেরছাভাবে ঢুকে গেছে বার্গের অভ্যন্তরে। কুল কুল শব্দে পানি ঢুকছে ভেতরে। চাঁদের আলোয় চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল রানা। বিপরীতমুখী কোন স্রোত নেই। দম নিয়ে নির্দেশ দিল, চড়া গলায়, 'খুলে দাও ফ্লোট!'

ছুরি নিয়ে তৈরি ছিল নিয়াজ। এক হাতে রশিটা ধরে, অপর হাতে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ছুরি চালাল। শক্ত ফাইবার, সহজে কাটতে চায় না। তার পিছনে রানা আর বিনয় দেরি দেখে ছটফট করছে। রানার হিসেবে, বিস্ফোরণ ঘটতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। তবে

হাতে ঘড়ি না থাকায় নিশ্চিত হবার উপায় নেই। হয়তো সাতমিনিট বাকি, কিংবা তিন মিনিট।

শেষ পর্যন্ত রশিটা কাটতে পারল নিয়াজ, কিন্তু কয়েকটা চিকন রোঁয়া রয়ে গেল, লঞ্চের সাথে আটকে রাখল ভেলাটাকে। অশ্লীল একটা গালি বেরিয়ে এল নিয়াজের মুখ থেকে। ইতিমধ্যে হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে গেছে রশি। তার সাহায্যে এগিয়ে এল বিনয়, হাতে নিজের ছুরি। অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল রানা, হুইল ছেড়ে যেতে পারছে না। গুহামুখের প্রকাণ্ড হাঁ ক্রমশ এগিয়ে আসছে, স্রোতের টানে ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে চলেছে লঞ্চ।

কেঁপে উঠল রানা, 'কি করছ তোমরা!'

অনেক কষ্টে রশিটা আবার ধরতে পারল নিয়াজ। রোঁয়াগুলোর ওপর ছুরি চালাল বিনয়। বিদায় নিল ফ্লোট। হাতের এক ঝাপটায় থ্রটল খুলে দিল রানা, ঝাঁকি খেয়ে ছুটল লঞ্চ, গোস্ট বার্গকে পিছনে রেখে দূরে সরে আসছে। চ্যানেল ধরে কোনাকোনি এগোল ওরা, সেই সাথে রিসার্চ শিপ রিগার আওয়াজ আরও জোরে বাজল কানে। কিউটের দিকে যাচ্ছে লঞ্চ, কিন্তু আইসব্রেকারকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না।

স্টার্নে উবু হয়ে বসে পিছনে তাকিয়ে আছে বিনয়। ফ্লোটটা ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে দুলছে। স্রোত ওটাকে গুহার ভেতর নয়, গুহার সামনে দিয়ে আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গুহা-মুখের পাশে, বরফের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেলো ভেলা। মনে হলো ফিরে আসবে। কিন্তু না, ওখানেই থেমে থাকল। গাল-মন্দ করছে বিনয়, ঠোঁট নড়লেও কোন আওয়াজ নেই। তারপর, হঠাৎ করে, গুহার ভেতর থেকে কেউ যেন হ্যাঁচকা টান মারল, চোখের পলকে স্যাৎ

করে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল ফ্লোটটা।

হাঁফ ছাড়ল বিনয়।

লঞ্চ নিয়ে এগোতে গলদঘর্ম হচ্ছে রানা। বড় একটা বরফের চাঁই দেখে বন বন করে হুইল ঘোরাল, কাত হয়ে পড়ল দ্রুতগতি লঞ্চ, মনে হলো উল্টে যাবে, তারপর আবার সিধে হলো। ছোট বড় অসংখ্য বরফের টুকরো ভাসছে চ্যানেলে, মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটছে লঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত লঞ্চ চালানো মানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা। অথচ বাঁচার একমাত্র উপায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিস্ফোরকের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া।

ওদের ডান দিক থেকে এখনও মাথার ওপর ঝুঁকে রয়েছে গোস্ট বার্গ, সেটার বিস্তার ওদের সামনে দক্ষিণ বরাবর যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর।

হুইলের সাথে যেন কুস্তি লড়ছে রানা।

মনে হলো বহু দূরে একটা নিঃসঙ্গ আলো মিটমিট করছে। কিউটের পিছনে জ্বলছে ওটা। ওই একটাই, বাকি সব আলো কি মনে করে কে জানে নিভিয়ে দিয়েছেন গোল্ডম্যান। আইসব্রেকারের পিছনে হালকা খয়েরি ফেনা দেখা গেল, ওদের বাঁ দিকে। ঠাণ্ডা হুল-ফোটানো বাতাসে চোখ-মুখ নীল হয়ে গেল। বরফের টুকরোগুলোকে এড়াবার জন্যে এঁকেবেঁকে ছুটছে লঞ্চ। আর পিছু পিছু ধেয়ে আসছে ষোলো হাজার টনী রুশ রিসার্চ শিপ রিগা—গোস্ট বার্গের প্রায় গা ঘেঁষে।

এবার সত্যি ভয় পেল ওরা। কেউ ভাবতেও পারেনি এমন হুট করে এত কাছাকাছি চলে আসবে রিগা। রিসার্চ শিপের স্পীড লিমিট সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিল ওরা।

‘গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!’ হামাগুড়ি দিয়ে রানার পাশে চলে এল নিয়াজ।

দূরে, কিউটের সামনে, দৃশ্যটা বদলে যাচ্ছে। রানার মনে হলো, গোল্ডম্যান অনেক দেরি করে ফেলেছেন। চ্যানেলের মুখে, দু’পাশে অটল দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল প্রকাণ্ড দুটো আইসবার্গ–হঠাৎ করে দুটোই বিপরীতমুখী দুই স্রোতের মধ্যে পড়ে যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। সচল হয়ে উঠে পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে। কিউট যখন ওখানে পৌঁছুবে, পথটা খোলা থাকবে না। নিয়াজ ভুল বলেনি, সত্যিই গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আঁতকে উঠে দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা। আকারে ছোটখাট একটা বাড়ি, ধাক্কা লাগার দরকার হবে না, ঘষা লাগলেই উল্টে যাবে লঞ্চ–এই সাইজের বরফ সামনে আরও দু’একটা দেখা গেল। ঘুর পথে এগোতে হলো ওদেরকে, ফলে আরও পিছিয়ে পড়ছে লঞ্চ। দু’একটা নয়, খানিক পরপর একটা করে, অনেকগুলো বড় বড় চাঁই সামনে। যে-কোন একটার সাথে ধাক্কা লাগা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তবু রানা বেপরোয়া, স্পীড না কমিয়ে আরও বাড়িয়ে দিল। ওর এই দুঃসাহসের ফলও ফলল হাতেনাতে। কিউটের আলো আগের চেয়ে উজ্জ্বল দেখল ওরা। তারমানে মাঝখানের দূরত্ব কমছে। স্টারবোর্ডের দিকে তাকাল রানা। অবাক হয়ে গেল ও। গোস্ট বার্গের শেষ প্রান্ত ছাড়িয়ে সামনে চলে এসেছে লঞ্চ।

‘পাওয়ার! আরও পাওয়ার!’ ফুঁসে উঠল কর্নেল বলটুয়েভ। ‘ওভারটেক করো!’

কোন কথাই বলল না ট্রাভকিন। নিজের জাহাজে তার কোন কর্তৃত্ব নেই। স্টারবোর্ড দিকের জানালা পথে বিশাল আইসবার্গ আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে। এতক্ষণে ট্রাভকিন লক্ষ করল, আইসবার্গটার গোড়ায় একটা ফাঁক রয়েছে। তারমানে কি ফাঁকা ওটা? গোস্ট বার্গ?

চোখে ব্যথা, পানি ঝরছে, ডুবে থাকা লম্বা বরফটা দেখতে পেল না রানা। লম্বায় চল্লিশ ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফিটের কম নয়, লঞ্চের সামনে আড়াআড়িভাবে পড়ল। লঞ্চের বো ধাক্কা খেলো, লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে, টুকরোটাকে টপকে যেতে শুরু করল লঞ্চ।

লঞ্চ উঁচু হতে শুরু করতেই একটা হার্টবিট মিস করল রানা। প্রপেলার ধাক্কা খাবে বরফের সাথে, দুমড়েমুচড়ে গিয়ে হয়তো লঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। লঞ্চের বো উঠে গেল, তারপর নামতে শুরু করল। খোলের সাথে বরফের ঘষা অনুভব করল ওরা, তারপর কড়াৎ করে আওয়াজ হলো–মাঝখান থেকে ভেঙে গেল টুকরোটা। শূন্যে উঠে পড়ল প্রপেলার, উড়ে পেরিয়ে এল টুকরোটাকে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল লঞ্চের পিছনটা। সেই সাথে আকাশ-ছোঁয়া বরফ-পাঁচিলের ভেতর বিস্ফোরিত হলো ফ্লোটিং মাইন।

প্রথম দিকে একের পর এক ঘটনা যা ঘটল, সব গোস্ট বার্গের ভেতরে। যে টাওয়ারটা লক্ষ টন ঝুল-বরফের ভার বহন করছিল, প্রথমে ধসে পড়ল সেটা। তারপর সার সার স্তম্ভগুলো কাত হলো ধীরে ধীরে, বড় বড় টুকরোয় ভাগ ভাগ হয়ে খসল। ঝপাৎ ঝপাৎ করে পড়তে লাগল বার্গের ভেতর লেকে। তারপর কাত হয়ে থাকা

স্তম্ভগুলো আছাড় খেতে শুরু করল। একেকটার ওজন হবে হাজার দু'হাজার টন।

স্তম্ভগুলোর মাথায় ছিল অসংখ্য চওড়া সেতু, তিনশো ফিট ওপর থেকে নেমে এল সেগুলো। লেকের কিনারায় বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ তুলে পড়তে লাগল একের পর এক। লেকের ভেতরটায় সচল হিমবাহের মহা আলোড়ন উঠল। টাওয়ার গেল, বিশাল ঝুল বরফ গেল, গোস্ট বার্গের পাঁচিলটাকে ঠেক দিয়ে রেখেছিল অবলম্বনগুলো, সেগুলোও গেল। থাকল শুধু দীর্ঘ পাঁচিল। কিন্তু এবার অবলম্বনহীন পাঁচিলের একটা অংশও কাত হতে শুরু করল। সেই সাথে প্রকৃতির এক ভয়ঙ্করতম দৃশ্য উন্মোচিত হলো ধীরে ধীরে।

পাঁচিল কাত হলো ভেতর দিকে, রিগার উল্টোদিকে। দৃশ্যটা চাক্ষুষ করে স্রেফ পাথর হয়ে গেল রিগার লোকজন। উঁচু পাঁচিল, খানিক আগে যেটা ওদের মাথার ওপর আকাশ ছুঁয়ে ছিল, কাত হয়ে ধসে পড়ল পিছন দিকে। কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না বলটুয়েভ। ট্রাভকিনের দিকে তাকাল সে, ক্যাপটেনের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে।

'গোস্ট বার্গ...!' পতনের একনাগাড় গর্জন প্রতিধ্বনি তুলছে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল ট্রাভকিন। ভয়েস-পাইপের দিকে ছুটে গেল সে, চিৎকার করে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই...ভয়ের কিছু নেই...'

ট্রাভকিন ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। ভুলটা ধরিয়ে দিতে পারত রানা। রাশিয়ানরা যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য চাক্ষুষ করছে, যা ঘটবে তার তুলনায় এ কিছুই না। মাত্র প্রস্তুতি নিচ্ছে দানব প্রকৃতি।

‘শালার গোস্ট বার্গ পিছন দিকে পড়ল!’ আক্ষেপের সাথে চিৎকার করে উঠল নিয়াজ। ‘কানা ভূতটা...’

‘চুপ থাকো!’ ধমকে উঠল রানা। ‘গাল দিও না বেচারাকে!’

বার্গের সামনে পানিতে আলোড়ন উঠল। ফুলে উঠল পানি, বড় বড় ঢেউ তৈরি হলো। কিন্তু এটা রানার উদ্বেগের কারণ নয়। তীব্র স্রোতের সাথে উঁচু পাহাড়ের মত ঢেউ আসবে–আসবেই, জানে ও। সবাই তাকিয়ে আছে পানির ওপরে, বার্গের দিকে। কিন্তু রানা ভাবছে পানির নিচের কথা।

বাঁচতে হলে দূরে পালাতে হবে। কিউটে না উঠতে পারলে নির্ঘাত মরণ। পিছনে কি ঘটছে ভুলে থাকার চেষ্টা করল রানা, সমস্ত মনোযোগ দিল লঞ্চ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ওপর। লঞ্চে থাকলে ডুবে মরবে সবাই, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

রিগা তার কোর্স ধরে আগের মতই ছুটছে, ধসে পড়া গোস্ট বার্গটাকে পাশ কাটিয়ে আসছে। পাঁচিলের একটা মাথা, পিছন দিকে যেটা আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে এখনও, এবার সেটা ধসে পড়ল। বিশেষ কোন দিকে কাত হলো না, সম্ভবত ফাঁপা বলেই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল ফুটবল মাঠ আকৃতির বার্গের মেঝেতে।

লক্ষ টন ধসে পড়া বরফের চাপে গোস্ট বার্গের আরেক প্রান্ত, আধ মাইল লম্বা প্ল্যাটফর্ম বলা যেতে পারে, গম্বুজের আকৃতি নিয়ে ফুলে উঠতে শুরু করল। প্ল্যাটফর্মে পাঁচিলের যে অংশটা এখনও খাড়া হয়ে রয়েছে সেটা মস্ত একটা পাহাড়ের মত দেখতে, কিন্তু পানির তলা থেকে ধীরে ধীরে যেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তার তুলনায় ওটা কিছুই না।

বিশাল এলাকা জুড়ে উথলে উঠল সাগর। সারফেস থেকে উঁচু

হয়ে উঠল পানি, যেন ভোজবাজির মত সী-লেভেল দ্রুতবেগে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। তারপর দেখা গেল ডুবে থাকা নিরেট বরফ-পাঁচিল, সাগরের তলা থেকে যেন জেগে উঠছে একটা মহাদেশ। পাঁচিলের মাথা আর গা থেকে বিপুল জলরাশি জলপ্রপাতের মত নামছে। নায়াগ্রাও বোধহয় হার মানবে এর কাছে।

পাঁচিলের সাথে মাথাচাড়া দিল অনেকগুলো টাওয়ার, কোন্‌টা কোন্‌টার চেয়ে আগে আকাশ ছুঁতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছে। একটা টাওয়ার রিগার ব্রিজ, তারপর মাস্তুল ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠে গেল, চওড়া পাঁচিলটা অনুসরণ করল সেটাকে, অন্যান্য টাওয়ারগুলোও পিছিয়ে থাকল না। রিগার ব্রিজ থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল কর্নেল বলটুয়েভ আর ট্রাভকিন, পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ সচেতন নয়।

অসুস্থ বোধ করল কর্নেল। সেই সাথে অসময়োচিত একটা অস্বস্তি। অস্বস্তির কারণটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারল না সে। ট্রাউজার ভিজে গেছে, কিন্তু টের যে পাবে, সে-অনুভূতি তার নেই।

জলপ্রপাতের চওড়া একটা বিরতিহীন ধারা প্রচণ্ড গর্জনের সাথে রিগার ওপর পড়তে লাগল। শুধু যে পানি তা নয়, পানির সাথে বরফের চাঁইও রয়েছে। একেকটা একশো থেকে হাজার টন ওজনের। গুঁড়িয়ে গেল রেইল। তুবড়ে গেল খোল। মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বরফ-পাঁচিল প্ল্যাটফর্মের সাথে ঘুরতে শুরু করল। দশ মিলিয়ন টন, কিংবা তারও বেশি বরফ, বিশাল এলাকা জুড়ে আলোড়িত হতে শুরু করেছে। টাওয়ার, পানি থেকে উঠে আসা পাঁচিল এখনও থামেনি, উঠে যাচ্ছে আরও ওপর দিকে। সেই

সাথে প্ল্যাটফর্মের সাথে একশো আশি ডিগ্রী কোণ রচনা করে ঘুরছে।

'ভগবান!' দু'হাতে মুখ ঢাকল বিনয়। 'এ আমি কি দেখছি! পাতাল থেকে আরেকটা দুনিয়া উঠে আসছে!'

রানা মাত্র একবার, পলকের জন্যে, পিছন ফিরে তাকাল। ওর একমাত্র প্রার্থনা, খোদা, সময় মত যেন কিউটে উঠতে পারি। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে স্রোতের মাথায় চড়ে ধেয়ে আসতে শুরু করবে ঢেউগুলো। ওদের পিছনে গোস্ট বার্গ উল্টে গেল।

বলা যায় গোটা আকাশটাই যেন ভেঙে পড়ল রিগার মাথায়। রিগার ব্রিজ থেকে ওরা দেখল ওদের মাথার ওপর বিশাল একটা ছায়া নেমে আসছে—ঘুরন্ত একটা ছায়া। নিজের অজান্তেই পারকার পকেট থেকে, শেষ মুহূর্তে, দাবা বোর্ডের খুদে সংস্করণটা বের করে দু'হাতে ধরে রয়েছে কর্নেল বলটুয়েভ। কোন্ খেলায় কবে হেরেছিল, চালে কোথায় ভুল করেছিল সেটা বোধহয় জানার ইচ্ছে হয়ে থাকবে। প্রথম বড় আঘাতটা এল। পাঁচিলের অর্ধেকটা আছাড় খেলো রিগার ওপর, ষোলোশো টন রিসার্চ শিপ তিন চার লক্ষ টন বরফে চাপা পড়ে গেল। রিগার কি ভাঙল বোঝা গেল না, বোঝার দরকারও ফুরাল। রিগা ছিল, ব্যস, অতীত হয়ে গেছে।

'জাম্প!' হুঙ্কার ছাড়ল রানা।

কিউটের স্টার্ন ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, জাহাজের মাঝখানে থেমেছে। খোলের সাথে ঘন ঘন বাড়ি খেলো লঞ্চ। আগেই ওদেরকে আসতে দেখেছেন গোল্ডম্যান, জাহাজের স্পীড কমিয়ে দিয়েছেন তিনি। ওপরের রেইল থেকে মই ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। 'জাম্প!' আবার গর্জে উঠল রানা।

একটা মই ধরে ঝুলে পড়ল নিয়াজ, বিনয়ও আরেকটা মই লক্ষ্য করে লাফ দিল। হুইলের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা, সচল খোলের পাশে লঞ্চটাকে ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। কিউটের পিছনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সাগর। ফুলে ওঠা বিপুল জলরাশি ধেয়ে আসছে বিপুল বিক্রমে।

ওপরের রেইল থেকে নতুন আরেকটা রশির মই ছুঁড়ে দিল কাফম্যান। রানার বুকে বাড়ি খেলো সেটা। মইটা ধরে হুইল ছেড়ে দিল ও। মুখ তুলে দেখল, রেইল টপকে জাহাজে উঠছে নিয়াজ আর বিনয়। রানার পায়ের নিচে থেকে সরে গেল লঞ্চ। মই আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল ও। রশিতে পা বাধল। মাথার ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠল কাফম্যান, 'কুইক, মি. রানা! কুইক, কুইক, কুইক!'

মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, চাপা একটা গর্জন শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। জাহাজের পিছন দিকে তাকাল ও। কিউটের স্টার্ন লক্ষ্য করে ছুটে আসছে পাহাড় সমান ঢেউ। ঢেউয়ের সাথে পিপে আকৃতির বড় বড় বরফের টুকরো। প্রতিটি ঢেউয়ের মাথায় ভারী টুকরোগুলো নাচছে। ঠিক এই ভয়ই করেছিল রানা। বরফের একটা টুকরো যদি ধাক্কা দেয়, খোলের গায়ে রক্ত মাংস লেপ্টে যাবে।

রেইলের ওপর ঝুঁকে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল নিয়াজ, বিনয়, আর কাফম্যান। পাগল হয়ে গেল নিয়াজ রানাকে উদ্ধারের জন্যে। আবার মই বেয়ে নামতে চায় সে। তাকে বাধা দেবে কি, বিনয়ও ফুঁপিয়ে উঠে অনুসরণ করল তাকে। কাফম্যানের একার পক্ষে ওদেরকে ধরে রাখা সম্ভব হলো না, অন্যান্য ক্রুরা সাহায্য

করল তাকে।

খোলের গায়ে ঝুলছে রানা। স্রোতের সাথে তীরবেগে ছুটে এল ঢেউ। শেষ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল কাফম্যানের গলা চিরে। আর কোন আশা নেই রানার। ওর জন্যে কারও কিছু করারও নেই। খোলের গায়ে মইয়ের শেষ মাথায় ঝুলে থাকল রানা। যমদূত এসে পড়েছে।

কিন্তু তবু সে মাসুদ রানা। আশা নেই জানে, জানে যতটুকুই ওঠার সুযোগ পাক ও, ঢেউ ওর নাগাল পেয়ে যাবে। কিন্তু হাল ছাড়ল না। এবং আশ্চর্য, ঢেউ এসে পড়ার আগেই অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এল রানা। এতক্ষণে আবার একবার কিউটের পিছন দিকে তাকাল ও।

মাথায় সাদা ফেনা নিয়ে সবুজ একটা পাঁচিল ছুটে আসছে, এরই মধ্যে ওর মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে সেটা। প্রথম ঢেউয়ের চূড়ায় নিরেট বরফের চাঁইটা দেখতে পেয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। একবার ভাবল, কি পাপ করেছে ও যে এই মৃত্যু ছিল কপালে! খোলের গায়ে ছাতু হয়ে যাবে শরীরটা।

ঢেউটা আঘাত করল কিউটের পিছনে। প্রায় এক ঝটকায় উঁচু করে তুলল স্টার্ন, সেই সাথে কিউটের সামনের অংশ, বো, ডুব দিল পানির তলায়। দস্তানা পরা হাত দিয়ে রশির মই কব্জিতে পেঁচিয়ে নিল রানা, অন্তত লাশটা যেন ভেসে না যায়। কনুই ভাঁজ করে মাথার দু'পাশে তুলল–ক্ষীণ আশা মাথাটাকে বাঁচাতে পারলে বলা যায় না, হয়তো...

লিফটের মত ওপরে উঠে যাচ্ছে স্টার্ন।

ঢেউয়ের ধাক্কা খেলো রানা, ধারাল দাঁতের মত সারা গায়ে

কামড় বসাল ঠাণ্ডা পানি। কাঁধের ওপর অসহ্য চাপ অনুভব করল ও। মনে হলো মই থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে ওকে। কানের পাশে একটানা শোঁ-শোঁ গর্জন। ওর পাশে, খোলে বোমা ফাটল যেন, বরফের একটা মস্ত চাঁই ভেঙে চুরমার হলো। আচমকা রানা উপলব্ধি করল, গুঁড়ো বরফের স্তূপের ভেতর ঢাকা পড়ে গেছে গোটা শরীর। প্রচণ্ড বেগে খোলের গায়ে আছাড় খেয়ে চাঁইটা গুঁড়ো হয়ে গেছে, অনেকটা জায়গা জুড়ে খোলের গায়ে চুম্বকের মত আটকে গেছে গুঁড়োগুলো, তারই ভেতর জ্যান্ত কবর হয়ে গেছে ওর।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে কিউট, ঢেউয়ের মাথায় শূন্যে উঠে পড়েছে স্টার্ন, কিন্তু রানা জাহাজের খোলের গায়ে একই জায়গায় রয়েছে। জ্যান্ত কবর হওয়াতেই বরং কিছুটা সময় বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেল ও। প্রবল স্রোত মই থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত ওকে, তা সম্ভব হলো না বরফের খোলসের ভেতর থাকায়।

এরপর বো উঠতে শুরু করল পানি থেকে। ধীরে ধীরে সিধে হলো কিউট। দ্বিতীয় ঢেউটা আসছে। কিন্তু তার আগেই রেইলের কাছ থেকে ওরা সবাই মই ধরে টানাটানি শুরু করেছে। বরফের খোলস ভেঙে বেরিয়ে এল রানা। ঠিক তখনই আবার উঁচু হতে শুরু করল স্টার্ন, আবার পানিতে ডুব দিল বো।

তীব্র স্রোত খোলের গায়ে চেপে রাখল রানাকে। ওপর থেকে ওরা বুঝতে পারল না রানা বেঁচে আছে কি না। মই টানছে না কেউ, রেইল ধরে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত সবাই।

রানা বেঁচে আছে, কিন্তু হুঁশ-জ্ঞান ভোঁতা হয়ে গেছে ওর।

মনে হলো, বাস্তবে এ-সব কিছুই ঘটছে না, গোটা ব্যাপারটাই দুঃস্বপ্ন। তারপর নিজেকে তিরস্কার করল ও, ব্যাটা উজবুক! টের পাও না মই থেকে ছুটে গেছে হাত, ভেসে যাচ্ছ…

মাথার দু'পাশ থেকে ভাঁজ করা কনুই দুটো নিজের অজান্তেই খসে পড়ল। খোলের সাথে ঠক-ঠক, ঠকাঠক বাড়ি খেলো খুলি। তারপর আবার পানি থেকে উঠল বো। চোখের সামনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি, তারপর অন্ধকার দেখল রানা। আলোর মধ্যে কাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল একবার, নিখুঁতভাবে চোখ টিপে দিল একটা। তাকে চিনতে পেরে একটুও অবাক হলো না রানা।

সোহানা।

বহু দূর থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর, শুদ্ধ বাংলায় চিৎকার করে বলল, 'ধরে থাকো, রানা, ধরে থাকো! আমরা তোমাকে টেনে তুলছি!' পরমুহূর্তে, নাকি মিনিট খানেক পর, বলতে পারবে না রানা, শক্ত কিসের সাথে যেন বাড়ি খেলো ও। অক্টোপাস? ওকে জড়িয়ে ধরছে কি ওগুলো?

হাত। মানুষের হাত।

চোখ মেলল রানা। চাঁদের আলো নিয়ে রাতের আকাশ—এ-ও কি স্বপ্ন? তারপর ডগা ভাঙা মাস্তুলটা দেখতে পেল। আগুপিছু দুলছে। কি যেন একটা খসে পড়ল ক্রস-ট্রী থেকে। মনে হলো ওর মুখের ওপর আছাড় খাবে। কিন্তু পড়ল ডেকের ওপর, ওর পাশে। না, কল্পনা নয়, ক্রস-ট্রী থেকে একজন লোকই পড়েছে। খুলি ফেটে গেছে লোকটার। মারা গেছে বেচারা।

কার মরার কথা কে মরছে!

সারা শরীর রক্তে জবজব করছে। ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হলো ওকে। আবার চোখ মেলে রানা দেখল, নিয়াজ আর বিনয়ের চোখে পানি। 'দূর বোকা! এমন ছেলেমানুষি করো তোমরা...' জোর করে হাসতে গেল রানা, সেই সাথে জ্ঞান হারাল।

বারো

ফুল স্পীডে ছুটছে কিউট। অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুত বেগে।

ক্রস কারেন্টের মধ্যে পড়ে সব ক'টা আইসবার্গ সচল হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে এগিয়ে এসে পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হবে। প্রায় সবগুলো এগিয়ে আসছে কিউটের দিকে। তবে ক্যাপটেন গোল্ডম্যান সমস্ত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছেন সামনের দুই দৈত্যের দিকে। পরস্পরের দিকে এগোচ্ছে সে-দুটো, বন্ধ করে দিচ্ছে চ্যানেলের মুখ। জাহাজের পোর্ট আর স্টারবোর্ড সাইডে একের পর এক নতুন নতুন আইসবার্গ বেরিয়ে আসছে কুয়াশা ছিঁড়ে, কিন্তু সেদিকে তাকাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যা কিছু হওয়ার হয়ে যাবে। হয় কিউট চ্যানেল থেকে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবে, না হয় দুই আইসবার্গের মাঝখানে পড়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হবে।

'ফুল পাওয়ার!' বারবার একই নির্দেশ দিচ্ছেন ক্যাপটেন।

ব্রিজে ঢুকল কাফম্যান। পোর্ট আর স্টারবোর্ডের দিকে তাকিয়ে ছানাবড়া হলো তার চোখ।

সম্মোহিতের মত সামনে তাকিয়ে আছেন গোল্ডম্যান, কাফম্যানের উপস্থিতি টের পেয়েছেন বলে মনে হলো না। হঠাৎ পকেটে হাত ভরে রুমাল বের করলেন তিনি, কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'সাংঘাতিক গরম!' পোর্টের দিকে তাকালেন না, তাকালে দেখতে পেতেন কেউ যদি একটা বোতল ছুঁড়ে মারে, আইসবার্গের গায়ে ভাঙবে সেটা।

সামনের ডেকে চাঁদের আলো নেই। জোড়া আইসবার্গের ছায়া পড়েছে। চোখে রাজ্যের আতঙ্ক নিয়ে ক্যাপটেনের দিকে তাকিয়ে আছে কাফম্যান আর হেলমসম্যান। গোল্ডম্যান জানেন, পোর্ট বা স্টারবোর্ডের দিকে তাকালে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন তিনি। বিপদ ভুলে থাকার জন্য হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'নাম্বার ওয়ানটার খবর কি?'

কিছুই বুঝতে না পেরে হেলমসম্যান আর কাফম্যান দৃষ্টি বিনিময় করল। ক্যাপটেন কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন?

'কার কথা বলছেন, স্যার?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল কাফম্যান।

'নাম্বার ওয়ান। গোঁয়ার দি গ্রেট। চতুর নেকড়েটা, আর্কটিক যাকে অচ্ছ্যুৎ মনে করে ছোঁয় না। হাতের তালুতে আইসবার্গ নিয়ে খেলে। এখনও বুঝতে পারছ না কার কথা জিজ্ঞেস করছি?' কথা বলতে বলতেই আবার সামনের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন।

'মি. কাফম্যান,' হঠাৎ ভারী গলায় বললেন ক্যাপটেন, 'পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকাও!' ক্যাপটেনের

সম্বোধনই কাফম্যানকে জানিয়ে দিল, অ্যাকটিং মেট থেকে মেট-এ পরিণত হয়েছে সে।

‘পেরিয়ে এসেছি!’ উল্লাসে কাফম্যানের গলা কেঁপে গেল। ‘গেট থেকে বেরিয়ে এসেছি!’

‘মেইন্টেইন ইওর প্রেজেন্ট কোর্স।’

সামনে, বহুদূর আকাশে, ম্লান একটা আলো দেখা গেল। আর্কটিকে ফিরে আসছে সূর্য। ভারী কুয়াশা থাকায় এই আলোর আভা দিনের পর দিন অদৃশ্য ছিল। পিছনের জানালা দিয়ে স্টার্নের দিকে তাকাল কাফম্যান। দুই আইসবার্গের মাঝখানে চ্যানেলের মুখ এত সরু, ছোট একটা লঞ্চও এখন গলবে না।

‘ক্লিয়ার ওয়াটার অ্যাহেড, মি. কাফম্যান,’ ক্যাপটেনের ভারী গলা ব্রিজের ভেতর গম গম করে উঠল। ‘আমরা বাড়ি ফিরছি।’

‘ইয়েস, স্যার!’ বলে স্যালুট ঠুকল মেট কাফম্যান।

‘কিন্তু তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, মি. কাফম্যান?’

‘ইয়েস, স্যার। মি. রানা জ্ঞান হারিয়েছেন, তবে ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছে, দু’দিনের মধ্যে হাঁটাচলা করতে পারবেন তিনি। জখমগুলো সারতে অবশ্য আরও ক’টা দিন সময় নেবে…’

সাতই মার্চ, বুধবার, কুইবেকে নোঙর ফেলল কিউট। গ্যাংওয়েতে রানাকে বিদায় জানাল নিয়াজ আর বিনয়। জাহাজে করে আমেরিকান আর্কটিক রিসার্চ সেন্টারে ফিরে যাবে ওরা, নিজেদের কর্মস্থলে। পালা করে দু’জনের সাথে হ্যান্ডশেক করল রানা, তারপর বুকে জড়িয়ে ধরল। দু’জনই ওরা হাসছে।

জাহাজ থেকে প্রথমে নামল ইভেনকো রুস্তভ। রানার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় তার মুখে বিজয়ীর হাসি দেখা গেল। ভাবটা যেন, কেমন ঠক্ দিলাম! দেখেও না দেখার ভান করল রানা।

গোল্ডম্যান, কাফম্যান, আর হিগিনের কাছ থেকে আগেই বিদায় নিয়েছে রানা। জেটি ধরে এগোল ও। জেটির শেষ মাথায় দুটো গাড়ি দেখল। গাড়ির পাশে জেনারেল ফচ, আর সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর উইলিয়াম অবসনকে দেখা গেল। ওদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে ইভেনকো রুস্তভ।

প্রথমে এগিয়ে এলেন জেনারেল ফচ। রানার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি। কর্নেল উইলিয়াম অবসন আলিঙ্গন করল রানাকে। মাথা আর কাঁধে ব্যান্ডেজ, ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠল রানা।

'আপনার জন্যে হিলটনের একটা স্যুইট রিজার্ভ করা হয়েছে, মি. রানা,' উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন জেনারেল ফচ। 'এয়ারপোর্টে একটা প্লেন রাখা হয়েছে, আপনার যখন খুশি...' কুইবেকে আসার পথে আমেরিকান একটা জাহাজের সাথে মাঝ সমুদ্রে দেখা হয়েছিল কিউটের, ওয়ায়েরলেসে সব খবরই পেয়েছেন তিনি।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'সরাসরি এয়ারপোর্টেই যাব আমি।'

'মেরিলিন চার্ট...'

'আমার কাছে, মি. ফচ,' তাড়াতাড়ি বলল ইভেনকো রুস্তভ। পারকার পকেট থেকে টিউবটা বের করল সে। জেনারেল ফচ আর কর্নেল অবসনের সাথে তার পরিচয়, ইত্যাদি আগেই হয়ে গেছে। হঠাৎ রানার দিকে ফিরল রুস্তভ। 'আগেই জানিয়েছি, আপনি আমেরিকান নন বলে আপনার ওপর ততটা বিশ্বাস আমি রাখতে পারিনি, মিস্টার রানা।' টিউবটা ঝাঁকাতে শুরু করল সে। তালুর

ওপর এক টুকরো কোর পড়ল। আবার ঝাঁকাল রুস্তভ। এবার পড়ল মাইক্রোফিল্ম। 'আপনি জানেন, এটাই আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম। আপনাকে তাই আমি জানিয়েছিলাম।' হাসতে লাগল সে। 'কিন্তু এটার কথা আপনাকে আমি জানাইনি,' বলে টিউবটা আবার ঝাঁকাতে শুরু করল। এবার আরও এক টুকরো কোর বেরুল টিউব থেকে। তবু টিউবটা ঝাঁকাচ্ছে রুস্তভ। সবশেষে আরেকটা মাইক্রোফিল্মের মোড়ক বেরুল ভেতর থেকে। 'মি. রানা, এটাই হলো আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম। প্রথমটা আপনি দেখেছেন, কিন্তু সেটা নকল–কাজেই আপনি দেখে থাকলেও কিছু আসে যায় না।' যেন মস্ত এক রসিকতা করেছে, একা একাই হো হো করে হাসতে লাগল রুস্তভ।

রানার ইচ্ছে হলো বলে, বোকচন্দর, জাহাজে থাকতে টিউব টিউব করে জান দিচ্ছিলে বলে আমাদের সন্দেহ হয়, টিউবের ভেতর আরও একটা মাইক্রোফিল্ম আছে, এবং সেটাই আসল মেরিলিন চার্ট। তাই কৌতূহলী হয়ে টিউবটা আমরাও ঝাঁকাতে শুরু করি। বেরিয়ে আসে দ্বিতীয় মাইক্রোফিল্ম। যদি জানতে, সেটা এখন আমার বগলের তলায় টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে! প্রথম মাইক্রোফিল্মের দুটো ফটোকপি তৈরি করি আমরা, সে-দুটো টিউবে ভরে রাখি, তারপর টিউবটা ফিরিয়ে দেয়া হয় তোমাকে। তোমার হাতে যে দুটো মাইক্রোফিল্ম শোভা পাচ্ছে, ব্যাটা হাড়ে-বজ্জাত, নকল চার্টের কার্বন কপি ওগুলো। কিছুদিন যাক, দুটোই যে নকল, টের পাবে বাছাধন। আমেরিকানরা তখন তোমার পাছায়...। কিন্তু কিছুই তাকে বলল না রানা। চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে জেনারেল ফচকে বলল, 'এয়ারপোর্ট

পর্যন্ত আমাকে একটা লিফট দেবেন, প্লীজ?'

'ও, শিওর, গ্ল্যাডলি!' জেনারেল ফচ নয়, সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল অবসন রানার হাত ধরে একটা গাড়ির দিকে এগোল। গাড়িতে ওঠার আগে, কি মনে করে ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকাল রানা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ইভেনকো রুস্তভকে ভেঙচাল ও।

এয়ারপোর্টে যাবার পথে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। আসল মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্মটা রাশিয়ানদের ফিরিয়ে দিতে হবে। কাজটা ঢাকায় পৌঁছেও সারা যায়। সোভিয়েত দূতাবাসে যেতে হবে ওকে।

খুক করে কেশে কর্নেল অবসন বললেন, 'কি ভাবছেন, মি. রানা?'

রানা হাসল। কিছু বলল না।

'আপনি শুনে খুশি হবেন, মি. রানা,' আবার বলল কর্নেল অবসন, 'আমাদের প্রেসিডেন্ট এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত সব জেনেছেন। তিনি যে খুশি হয়েছেন, ধন্যবাদ দিয়েছেন, এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সেটা আপনাকে জানাবার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।'

'কেউ বলতে পারবে না আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেননি,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'ধন্যবাদ, মি. রানা, অসংখ্য ধন্যবাদ।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করল কর্নেল অবসন, 'ভবিষ্যতে যদি কোন দরকার হয়, আশা করি আবার আমরা আপনার সাহায্য পাব...?'

'ভবিষ্যৎই সে-কথা বলতে পারে...'

'না, প্লীজ, এড়িয়ে যাবেন না,' আবেদনের সুরে বলল অবসন।

ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা। 'আপনাকে যেন সিরিয়াস মনে হচ্ছে?'

'সিরিয়াস? হ্যাঁ, অবশ্যই। সত্যি কথা বলতে কি, জটিল একটা অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে আমার হাতে। কিন্তু যোগ্য লোকের অভাবে...'

'সি.আই.এ-তে যোগ্য লোকের অভাব?' হেসে উঠল রানা।

কর্নেল গম্ভীর। 'বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাদের হাতে মাঝে মধ্যে এমন টপ সিক্রেট কাজ থাকে, নিজেদের কোন এজেন্টকে বিশ্বাস করে সে-কাজ দেয়া চলে না। সেই রকম একটা কাজের কথা নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই আমি...'

হাতজোড় করল রানা। 'এখন? মাফ করুন!'

হেসে ফেলল কর্নেল। 'ঠিক আছে, পরে একসময়। আমিই যোগাযোগ করব। তার আগে একটু বলে রাখি, কাজটা করে দেয়ার অনুরোধ শুধু আমার তরফ থেকে নয়, প্রেসিডেন্টের তরফ থেকেও পাবেন আপনি। আশা করি প্রত্যাখ্যান করবেন না।'

'দেখা যাবে।'

এরপর রানাকে আর বিরক্ত করল না অবসন।

***

রানা-১৪২

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

মরণখেলা-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

বন্ধক-দ্বীপ আই. আই. কাইতে
অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল রানা—
প্লেনটা ল্যাণ্ড করতে পারলেই বেঁচে যাবে ওরা,
রুশ বিজ্ঞানী ইভেনকো ঝুকভকে নিয়ে
চলে যাবে নাগালের বাইরে।

কিন্তু তা হবার নয়।
নিরাপদেই ল্যাণ্ড করলো বটে, কিন্তু কিছুদূর
এগিয়েই বিস্ফোরিত হলো প্লেন।

কাছেই অপেক্ষা করছে কর্নেল বলটুকভ।
রানা জানে, প্রথম সুযোগেই ওকে
ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে কর্নেল।

শুরু হলো স্লেজ টিম নিয়ে পলায়ন,
রানার জীবনের ভয়ঙ্করতম অভিযান।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম ঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আঠারো টাকা